কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয় যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বক্তব্যের বিরোধী কি নয়) তাহলে (তা রসূলুল্লাহ্ [সা]-এর বর্তমান হলে তাঁরই কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে। পক্ষান্তরে যদি তাঁর ওফাতের পরে হয়, তবে মুজতাহিদ ইমাম ও ওলামাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে এবং) সে বিষয়টি আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র হাওয়ালা করবে (এবং ওলামারা যে ফতোয়া দেবেন, সে সবাই আমল করবে) যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়ে থাক। (কারণ, বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে জবাবদিহির ভয় করা ঈমানেরই তাকীদ।) এসব বিষয় (যা বলা হলো অর্থাৎ আল্লাহ্, রসূল ও শাসকদের আনুগত্য করা (এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহ আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ্র সমর্পণ করা পার্থিব জীবনেও) উত্তম এবং (পরকালের জন্যও) এর পরিণতি অত্যন্ত কল্যাণকর। (কারণ, এতে পার্থিব শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং পারলৌকিক মুক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়)।

আয়াতের শানে-নযুল ঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা হল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে করা হত। খানায়ে-কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজে তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহর বিশেষ বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হত। জাহিলিয়াত আমল থেকেই হজ্জের মওসুমে হাজীদের 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সা)-র পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সাকায়া'। এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু সেবার দায়িত্ব হুযুর (সা)-এর অন্য পিতৃব্য আবূ তালিবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেওয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল উসমান ইবনে তালহার উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং উসমান ইবনে তালহা (রা)-র ভাষ্য হল এই যে, জাহিলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বৃহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহ্র দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশলাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সা) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে গেলে উসমান (যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেন নি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সা) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাম্ভীর্য সহকারে উসমানের কটূক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে উসমান, হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহ্র এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। উসমান ইবনে তালহা (রা) বলল, তাই যদি হয়, তবে কোরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হুযুর বললেন, না, তা নয়। তখন কোরাইশরা আবাদ হবে, তারা হবে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহ্র ভেতরে তশরীফ নিলেন। (উসমান বলেন,) তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার যেন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যা কিছু বললেন, তা অবশ্যই হবে।

সে মুহূর্তেই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের গতিবিধি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হওয়ার পর রসূলে করীম (সা) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহ্‌র চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, উসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ্‌র উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রা) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার কাছ থেকে বল-পূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হুযূরের হাতে অর্পণ করলেন। যা হোক, বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সা) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য কেউ যদি তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চায় সে হবে জালিম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহ্‌র এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার করবে।

উসমান ইবনে তালহা (রা) বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হৃষ্টচিত্তে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, উসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হল নাকি ? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন, "একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে।" তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে আর তৎক্ষণাৎ আমিও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম।---(মাযহারী)

হযরত ফারূক আ'যম উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সা) বায়তুল্লাহ্‌ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি আবৃত্ত হচ্ছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

এর আগে আমি কখনো এ আয়াত তাঁর মুখে শুনিনি। বলা বাহুল্য, এ আয়াতটি তখনই কা'বার অভ্যন্তরে নাযিল হয়েছিল। এ আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশ পালনকল্পেই তিনি পুনরায় উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে কা'বার চাবি তাঁর হাতে অর্পণ করেন। কারণ, উসমান ইবনে তালহা যখন এ চাবি মহানবী (সা)-র নিকট অর্পণ করেছি-লেন, তখন বলেই দিয়েছিলেন যে, এ আমানত আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি। যদিও নিয়মানুযায়ী তাঁর একথা যথার্থ ছিল না, বরং তখন যাবতীয় অধিকার রসূলে করীম (সা)-এরই ছিল। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারতেন, কিন্তু কোরআনে করীম এক্ষেত্রেও আমানতের বাহ্যিক রূপের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহানবী (সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, উসমানকেই চাবি ফিরিয়ে দাও। অথচ তখন হযরত আব্বাস ও হযরত

আলী (রা)-ও হুযুরের কাছে এ নিবেদন করেছিলেন যে, যেভাবে 'সাকায়াহ' ও 'সাদানাহ'-এর দায়িত্ব আমাদের হাতে রয়েছে, এই চাবি বহনের খেদমতও আমাদেরকেই দিয়ে দিন। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের হেদায়েত অনুযায়ী তিনি তাঁদের সে নিবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং চাবি উসমান ইবনে তালহাকেই ফিরিয়ে দেন। ----(তফসীরে মাযহারী)

এ পর্যন্ত আয়াতের শানে-নযুল সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কোন আয়াতের শানে-নযুল কোন বিশেষ ঘটনা হলেও তার হুকুম হয়ে থাকে ব্যাপক। সমগ্র উম্মতের জন্যই তার অনুবর্তিতা অপরিহার্য হয়ে থাকে।

এবারে এর অর্থ ও মর্মের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ـ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।" এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হল এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য, যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সাধারণ জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আমানত পরিশোধের তাকীদ ঃ বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সেই আমানত প্রাপককে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সা) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এমন খুব কমই হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেন নি ঃ

لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له

অর্থাৎ "যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই!"—(শোয়াবুল ঈমান)

খেয়ানত মুনাফিকীর লক্ষণ ঃ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মুনাফিকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ এটাও বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ ঃ এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়-টিকে امانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যে কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র 'আমানত' নয়, যাকে সাধারণত আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয় বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-নযুল প্রসঙ্গে এখনই যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে,

তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহ্‌র চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহ্‌র খেদমতের একটা পদের নিদর্শন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ্ তা'আলার আমানত ঃ এতে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ্ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ ও বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সেসব কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্য ঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি সে কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হবে। না তার ফরয (ইবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।---(জমউল-ফাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা ৩২৫)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কোন লোক যদি জেনে শুনে কোন যোগ্য লোকের পরিবর্তে অযোগ্য লোক কোন পদে নিয়োগ করে, তাহলে সে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং জনগণের গচ্ছিত আমানতের খেয়ানত করার মত কাজ করে। ইদানীং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তা সবই এই কোরআনী শিক্ষাকে উপেক্ষা করার পরিণতি। বর্তমানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আত্মীয়তা কিংবা সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী পদ ও পদমর্যাদা বন্টন করা হয়। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই অযোগ্য, অসমর্থ লোক বিভিন্ন পদ কব্জা করে বসে মানুষকে অতিষ্ঠ করে থাকে এবং গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বরবাদ হয়ে যায়।

সেজন্যই মহানবী (সা) এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন ঃ

اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة

অর্থাৎ "যখন দেখবে কাজের দায়িত্ব এমন লোকের হাতে অর্পণ করে দেওয়া হয়েছে, যে সে কাজের যোগ্য নয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর (এর কোন প্রতিকার নেই)। ---(বুখারী কিতাবুল-ইলম)

কোরআন করীম امانات শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, আমানত শুধু একজনের মাল অপর কারো নিকট গচ্ছিত রাখার নামই নয়, বরং আমানতের বহু প্রকারভেদ রয়েছে, যাতে সরকারী পদও অন্তর্ভুক্ত।

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ المجالس بالامانة অর্থাৎ উঠা-বসাও আমাতনদারীর সাথে হওয়া উচিত।

অর্থাৎ বৈঠকে যেসব কথাবার্তা বলা হয়, তা সে মজলিসেরই আমানত। মজলিসের অনুমতি ছাড়া তার আলোচনা অন্য কারো সাথে করা কিংবা ছড়ানো জায়েয নয়।

এমনিভাবে অন্য এক হাদীসে— المستشار مؤتمن অর্থাৎ যার কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তিনি সে ব্যাপারে আমানতদার। তিনি এমন পরামর্শই দেবেন, যা পরামর্শ গ্রহীতার জন্য কল্যাণকর হবে। জানা সত্ত্বেও কাউকে কোন রকম কুপরামর্শ দান করলে পরামর্শদাতা আমানত খেয়ানতের অপরাধে অভিযুক্ত হবে। তেমনি-ভাবে কেউ কারো কাছে নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করলে, তা তার অনুমতি ছাড়া অপর কারো নিকট প্রকাশ করাও খিয়ানত। উল্লিখিত আয়াতে এ সমুদয় আমানত রক্ষা করারই তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

এই ছিল প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যের তফসীর। পরবর্তীতে প্রথম আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যের তফসীর। وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ তোমরা যখন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে যাবে, তখন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। এতে প্রকাশ্যত বোঝা যায় যে, শাসকবর্গ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গই হলেন এই সম্বোধনের লক্ষ্য—যারা মামলা-মোকদ্দমা বা কোন বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে কোন কোন মনীষী প্রথমোক্ত বাক্যটির লক্ষ্যও শাসক শ্রেণী বলেই সাব্যস্ত করেছেন। যদিও প্রথম বাক্যের মত এ বাক্যেও সে সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, এর সম্বোধনের লক্ষ্যও হবে শাসক ও সাধারণ মানুষ উভয়ই। কারণ, সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিবদমান দুই পক্ষ তৃতীয় কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করে মীমাংসা করে থাকে। এ ভাবে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা সাধা-রণ মানুষের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রাথমিক দৃষ্টিতে উভয় বাক্যের দ্বারাই শাসক ও কর্তৃপক্ষীয় শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে বোঝা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, দুটি বাক্যেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শাসকবর্গ ও কর্তৃপক্ষ। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে এর লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐ সমস্ত লোক যাদের কাছে মানুষ নিজেদের আমানত গচ্ছিত রাখে এবং যাদেরকে কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সালিস সাব্যস্ত করা হয়।

এ বাক্যে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন বলেছেন ঃ بَيْنَ النَّاسِ (মানুষের মাঝে) بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (মুসলমানদের মাঝে) বলেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মামলা-মোকদ্দমা অথবা যে-কোন বিষয়ের মীমাংসার ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান। সে মানুষ মুসলমান হোক কি অমুসলমান, মিত্র হোক কি শত্রু, স্বদেশী হোক কি বিদেশী, স্ববর্ণ হোক বা অন্য বর্ণের, একই ভাষাভাষী হোক কি ভিন্নভাষী, মীমাংসাকারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হলো এই যে, কোন সম্পর্কের উর্ধ্বে থেকে যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হবে, তাই ফয়সালা করে দেবে।

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিন ঃ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসন-ক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ-উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাঁদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে!

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদিগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে প্রথমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক ; কোন ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেওয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেওয়া জায়েয নয়, তেমনিভাবে সরকারী পদ যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সেসব লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টন ঃ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লিখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবি-ধানেই প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুত এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারী পদ-সমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কোরআনে হাকীম পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ

করা যেতে পারে, তা সে যে কোন এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, তার কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি ঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথমত আয়াতের প্রথম বাক্য اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। পৃথিবীর শাসক-বর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই।

(২) দ্বিতীয়ত সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে। বরং এগুলো হল আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোকদেরই দেওয়া যেতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসাবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সেই সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেওয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থত তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমনকি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা সবার ফরিয়াদই শোনেন এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করারও সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালা সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত নীতিমালা ও সংবিধান শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রসূল এবং তোমা-দের সচেতন নেতাদের অনুসরণ কর।

'উলিল-আমর' কাকে বলা হয় ঃ 'উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সেই সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ মুফাস্সির ওলামা

ও ফুকাহা সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সা)-র নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসিরীনের অপর এক জামা'আত--যাঁদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন---বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর মর্ম হচ্ছে সেসব লোক যাঁদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তফসীরে-ইবনে কাসীর এবং তফসীরে-মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এ আয়াতে বাহ্যত তিনের আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে। (১) আল্লাহ্ (২) রসূল এবং (৩) উলিল-আমর। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, নির্দেশ ও আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্রই জন্য নির্ধারিত। বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ তবে তাঁর হুকুম ও তাঁর আনুগত্যের বাস্তবায়ন পদ্ধতি চারভাগে বিভক্ত।

(১) সে সমস্ত বিষয়ের হুকুম বা নির্দেশ যা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সরাসরি কোরআনে অবতীর্ণ করে দিয়েছেন এবং যাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ বা প্রয়োজন নেই। যেমন, শিরক ও কুফরীর চরম পাপ হওয়া, একমাত্র আল্লাহ্ ওয়াহ্দাহু লা-শারীকের ইবাদত করা, আখিরাত ও কিয়ামতে বিশ্বাস করা, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্র সর্বশেষ সত্য নবী বলে মান্য করা এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে ফরয মনে করা। এগুলো এমন বিষয়, যা সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ এবং এগুলোর সম্পাদন সরাসরিভাবে আল্লাহ্রই আনুগত্য।

(২) দ্বিতীয়ত আহ্কাম ও বিধি-বিধানের সেই অংশ যাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রায়ই কোরআন করীম এসবের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক নির্দেশ দিয়েছে এবং মহানবী (সা)-র উপর সেগুলোর বিশ্লেষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাদীসের মাধ্যমে দিয়েছেন, সেগুলোও এক প্রকার ওহীই বটে। এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোন রকম দ্ব্যর্থতা থেকে গিয়ে থাকলে, সেগুলোও ওহীরই মাধ্যমে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত মহানবী (সা)-র বিশেষ বাণী ও কাজ-কর্মসমূহও আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমসমূহেরই পরিপূরক হয়ে গেছে।

এ সমস্ত হুকুম-আহকামের আনুগত্য করা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য, কিন্তু যেহেতু প্রকাশ্যভাবে এসব হুকুম-আহ্কাম সরাসরিভাবে কোরআন নয়, মহানবীর বাণীর মাধ্যমে উম্মতের নিকট এসে পৌঁছেছে, সেহেতু সেগুলোর আনুগত্যকে বাহ্যত রাসূলের আনুগত্য বলেই অভিহিত করা হয়, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্যের অঙ্গীভূত হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটা পৃথক মর্যাদার অধিকারী। সে জন্যই সমগ্র কোরআনে আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে রাসূলের আনুগত্যের কথাটিও পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে সেসব আহ্কাম ও নির্দেশ যেগুলো পরিষ্কারভাবে না কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, না হাদীসে। এগুলোর ব্যাপারে আবার পরস্পরবিরোধী বর্ণনাও দেখা যায়। এমন সমস্ত হুকুম-আহকামের ব্যাপারে মুজতাহিদ ও গবেষক আলিমগণ কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রকৃষ্ট বক্তব্য ও আলোচ্য বিষয়ের নযীর-উদাহরণের উপর চিন্তা-ভাবনা করে তার হুকুম অনুসন্ধান করে নেন। প্রকৃতপক্ষে সরাসরি কোরআন-সুন্নাহ্ না হলেও যেহেতু কোরআন ও সুন্নাহই এসব আহকামের মূল উৎস, সেহেতু এগুলোর আনুগত্য করাও আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যেরই নামান্তর। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলোকে ফিকহী ফতোয়া বলা হয় এবং এগুলোকে আলিম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের এসব হুকুম-আহকামের মধ্যে এমন হুকুম-আহকামও রয়েছে, যাতে কোরআন-সুন্নাহ্র দিক দিয়ে কোন রকম বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বরং এসবে যারা আমল করবে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী যেভাবে খুশী আমল করতে পারে। পরিভাষাগত-ভাবে এগুলোকেই বলা হয় 'মোবাহ'। এ ধরনের হুকুম-আহকামের সম্পাদন ব্যবস্থার দায়িত্ব শাসক শ্রেণী ও কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। তারা অবস্থা ও কল্যাণ-অকল্যাণের প্রেক্ষাপটে বিচার-বিবেচনা করে সবাইকে তদনুরূপ পরিচালনা করবেন। যেমন, কোন একটি শহরে ডাকঘরের সংখ্যা পঞ্চাশ হবে কি একশ, পুলিশ স্টেশন বা থানা কয়টি হবে, রেলওয়ে ব্যবস্থা কিভাবে চলবে, পুনর্বাসন ব্যবস্থা কোন্ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে তৈরী হবে---এসব বিষয়ই হলো 'মোবাহ' বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর কোন দিকই ওয়াজিব অথবা হারাম নয়, বরং ঐচ্ছিক। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয়ের স্বাধীনতা জন-সাধারণকে দিয়ে দেওয়া হলে তাতে শাসনকার্য চলতে পারে না, কাজেই ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সরকারের হাতেই থাকে।

উল্লিখিত আয়াতে 'উলুল-আমরের' আনুগত্যের মর্ম ওলামা ও শাসন কর্তৃপক্ষ উভয়েরই আনুগত্য করা। অতএব, আয়াতের প্রেক্ষিতে ফিকহ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ফিকহ্বিদগণের আনুগত্য এবং শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করাও অপরিহার্য হয়ে গেছে।

এ আনুগত্যও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহ্কামেরই আনুগত্য। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব নির্দেশ বা হুকুম-আহ্কাম না আছে কোরআনে, আর না আছে সুন্নায়। বরং এগুলোর বিশ্লেষণ হবে ওলামাদের পক্ষ থেকে কিংবা শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। সেজন্যই এসবের আনুগত্যের বিষয়টিকে তৃতীয় পর্যায়ে পৃথকভাবে সাব্যস্ত করে 'উলুল্-আমর'-এর আনুগত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর যেভাবে কোরআনের 'নছ' বা সরাসরি আহ্কামের ক্ষেত্রে কোরআন এবং রসূলের সরাসরি নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে যেসব বিষয়ে কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন হুকুম নেই, সেগুলোতে ফিকহ্বিদ ওলামা এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অনুসরণ করাও ওয়াজিব। আর এটাই হল উলিল-আমর এর প্রতি আনুগত্যের মর্ম।

শরীয়ত বিরোধী কাজে শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ

اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا—আয়াতে আল্লাহ্ যে কাজটির কথা বলেছেন তা হল এই যে, তোমরা যখন মানুষের কোন বিষয়ের মীমাংসা করবে, তখন ন্যায়সঙ্গত-ভাবে করবে। আর এরই পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা 'উলিল্-আমর'-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শাসক যদি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে তার আনুগত্য করাও প্রজাদের পক্ষে ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যদি ন্যায় ও সুবিচার পরিহার করে তারা শরীয়ত বিরোধী হুকুম জারি করতে আরম্ভ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে শাসকদের আনুগত্য জায়েয নয়। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

অর্থাৎ "এমন কোন বিষয়ে কারো আনুগত্য জায়েয নয়, যাতে স্রষ্টার না-ফরমানীর কারণ হয়।"

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ—আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা যদি মানুষের মাঝে কোন বিষয়ের মীমাংসা কর, তবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে করবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা ও যোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না এমন লোকের পক্ষে কাযী বা বিচারক হওয়া উচিত নয়। কারণ, حكم بالعدل (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা)-ও একটি আমানত। অথচ কোন দুর্বলচিত্ত অযোগ্য লোকের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। কাজেই হযরত আবূ যর (রা) যখন হুযুরে আকরাম (সা)-এর নিকট আবেদন করেছিলেন যে, আমাকে কোনখানে শাসক নিযুক্ত করে দিন, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ

يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من اخذ بحقها وادى الذى عليه فيها ـ

অর্থাৎ হে আবূ যর! তুমি হলে একজন দুর্বল লোক। আর এ পদটি হলো একটি আমানত। যার জন্য কিয়ামতের দিন অত্যন্ত অপমান-অপদস্থতার সম্মুখীন হতে হবে। তবে যে লোক আমানতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারবে সেই এ অপদস্থতা থেকে রক্ষা পাবে।

ন্যায়ানুগ লোক আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ঃ এক হাদীসে হুযুরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, যারা ন্যায়ানুগ তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়তম ও নিকটতম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যারা জালিম, অত্যাচারী, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) সাহাবায়ে-কিরামকে লক্ষ্য করে

বলেছেন, সর্বাগ্রে আল্লাহ্ তা'আলার ছায়ায় (রহমতে) কে যাবে, তোমরা কি তা জান ? তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তারপর রসূলে করীম (সা) বললেন, এরা হলো সেই সব লোক, যাদের সামনে সত্য উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা গ্রহণ করে নেয়, যখন তাদের কাছে চাওয়া হয় তখন তারা সম্পদ ব্যয় করে এবং যখন তারা কোন বিষয়ের মীমাংসা করে, তখন তারা এমন ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তার মীমাংসা করে যেমনটি নিজের জন্য করে থাকে।

ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ ঃ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ- আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর।

কিতাব ও সুন্নাহ্র (বা আল্লাহ্ ও রসূলের) প্রতি প্রত্যাবর্তন করার দুটি দিক রয়েছে ঃ (১) তোমরা কিতাব ও সুন্নাহ্র সরাসরি হুকুম-আহ্কামের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। (২) দ্বিতীয়ত কোন বিষয়ে যদি কোরআন ও সুন্নাহ্র কোন সরাসরি নির্দেশ না থাকে, তবে (সেসব সরাসরি 'নছ'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) উদাহরণসমূহের উপর কিয়াস করে সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে فَرُدُّوهُ শব্দটি দু'টি দিকেই ব্যাপক।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا
إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا
أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا

أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

(৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। (৬১) আর যখন তুমি তাদেরকে বলবে, আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে এসো যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তখন তুমি মুনাফিকদের দেখবে, তারা তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। (৬২) এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা তোমার কাছে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সেই সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং তাদের সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বল যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্তুত আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল পাঠিয়েছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী তাদের নির্দেশ মান্য করা হয়। আর সেইসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন তোমার কাছে আসত; অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনি কি সেই সমস্ত লোককে দেখেন নি যারা (মুখে মুখে) দাবী করে যে, আমরা এ কিতাবের উপরও ঈমান রাখি যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং সেই সব কিতাবের প্রতিও (ঈমান রাখি) যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ তাতে মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আর অধিকাংশ মুনাফিকই ছিল ইহুদীদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা মুখে মুখে দাবী করে যে, আমরা যেমন তওরাতকে মান্য করি, তেমনি কোরআনকেও মানি। অর্থাৎ তারা মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু তার পরেও তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা) নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে উপস্থিত হতে চায়। (কারণ, যা শরীয়ত নয়, সেদিকে মোকদ্দমা নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তানই শিক্ষা দেয়। কাজেই এতে আমল করাটাই এমন, যেন শয়তানের কাছে মামলা নিয়ে উপস্থিত হল)। অথচ (দুটি বিষয় এর অন্তরায়। একটি এই যে, শরীয়তের পক্ষ থেকে) তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন শয়তানকে মান্য না করে (অর্থাৎ বিশ্বাসগত ও কার্যগতভাবে যেন তার বিরোধিতা করা হয়)। আর (দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা এই যে,) শয়তান (তাদের এমন শত্রু যে অকল্যাণ কামনা করে) তাদেরকে

(সত্যপথ থেকে) প্রতারিত করে বহুদূর নিয়ে যেতে চায় (এ দুটি অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও তারা শয়তানেরই আনুগত্য করে, অথচ এগুলোর তাকাদাই হলো শয়তানের কথামত আমল না করা)। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা এসো সেই নির্দেশের দিকে, যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং (এসো) রসূলের দিকে (তিনি তোমাদের আল্লাহ্র নির্দেশ মতই সিদ্ধান্ত দান করবেন), তখন আপনি তাদের অবস্থা এমন দেখবেন যে, মুনাফিকরা আপনার কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চলছে। এমতাবস্থায় তাদেরই পূর্বকৃত সে কর্মের দরুন তাদের উপর বিপদাপদ এলে কেমন দশাটা হবে যা তারা করেছিল (এই বিপদের) পূর্বে! (তাদের এই কার্যকলাপ বলতে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে শয়তানের কাছে যাওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। আর বিপদ অর্থ, তাদের নিহত হওয়া, কিংবা তাদের খিয়ানত ও মুনাফিকীর বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়া এবং এসব কাজের জন্য জওয়াবদিহির সম্মুখীন হওয়া। তখন তারা ভাবতে আরম্ভ করে যে, এ সমস্ত অপকর্মের কি ব্যাখ্যা তৈরী করা যায়, যাতে সম্মান অর্জন করা যেতে পারে?) তারপর (কোন একটি ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে) তারা আপনার কাছে উপস্থিত হয় (এবং) আল্লাহ্র কসম খেয়ে খেয়ে বলতে থাকে যে, (আমরা যে আপনার কাছ থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম, তাতে) আমাদের উভয় পক্ষের (অর্থাৎ আপনাদের ও আমাদের মঙ্গল (চিন্তা) ছাড়া অন্য কোন কিছুই উদ্দেশ্য ছিল না। (যাতে হয়তোবা এভাবে উভয়ের মঙ্গলের কোন একটা উপায় বেরিয়ে আসে এবং তাদের পরস্পর ঐক্য ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এই যে আইন-কানুন, তা একমাত্র শরীয়তেরই অধিকার, আমরা শরীয়তকে নাহক মনে করে যাইনি। তবে কথা হল এই যে, আইনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিচারক তো আর রেয়াত-মরুওতের কথা বলতে পারেন না। অথচ এতে প্রায়ই রেয়াত-মরুওত করিয়ে দেওয়া হয়। এটাই ছিল আমাদের অন্যত্র যাবার আসল কারণ। আর হত্যার ঘটনার যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা হয়তো ছিল সেই নিহত ব্যক্তির কর্ম সম্পর্কিত, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করে মুক্ত করিয়ে নেওয়া কিংবা হত্যার দায় হযরত উমর [রা]-এর উপর চাপানো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এসব অপব্যাখ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন,) এরা হলো এমন লোক যাদের মনের (কুফরী ও মুনাফিকী) সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন (যে, তাদের এসব কুফরী ও মুনাফিকী এবং শরীয়তের হুকুমের প্রতি অসন্তুষ্টির দরুনই এরা অন্যত্র চলে যায়। অবশ্য নির্ধারিত সময়ে তারা এসব কার্যকলাপের শাস্তিও পাবে)। অতএব, আপনি (আল্লাহ্র অবগতি ও বিচারের উপর ভরসা করে) তাদের (এসব বিষয়ের) প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করুন। (অর্থাৎ এসব বিষয়ে তাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না।) তাছাড়া (আপনার রিসালতের দায়িত্ব অনুযায়ী) তাদেরকে হেদায়েত করতে থাকুন (যাতে তারা এসব কাজ পরিহার করে) তাদেরকে তাদের নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সংশোধনমূলক কথা বলে দিন (যাতে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা না মানে, তবে তারাই বুঝবে)। আর আমি সমস্ত নবীকে বিশেষত এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম মোতাবেক (যেমন, নবী-রসূলদের আনুগত্য সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) তাঁদের আনুগত্য করে। (অত এব, প্রথমত শুরু থেকেই তাদের পক্ষে আনুগত্য করা

উচিত ছিল)। আর যদি (দুর্ভাগ্যবশত ভুল হয়েই গিয়ে থাকে, তবে) যখন (এ পাপের বশবর্তী হয়ে) সে নিজের ক্ষতি করেছিল তখন (অনুতপ্ত হয়ে) আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট (নিজেদের পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রসূলও যদি তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্ তা আলাকে তওবা কবূলকারী, দয়াশীল পেত (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দয়ায় তাদের তওবা কবূল করে নিতেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যাবতীয় ব্যাপারে রসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশের আনুগত্য করার হুকুম ছিল। পরবর্তী আয়াতে শরীয়ত বিরোধী বিধি-বিধানের দিকে ধাবিত হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের শানে-নযূল ঃ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, বিশ্‌র নামক এক মুনাফিক ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করে নিই। কিন্তু মুনাফিক বিশ্‌র এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। বরং সে কা'ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন সর্দার এবং রসূলে করীম (সা) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সা)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশ্‌র হুযুরের স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রসূলে করীম (সা) যে মীমাংসা করবেন, তা একান্তই ন্যায়সংগত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধীয় বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী (সা)-র উপর। পক্ষান্তরে মুনাফিক বিশ্‌র ছিল অন্যায়ের উপর। সেজন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে পরিচিত এবং সে ইহুদী।

যা হোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর তারা তাঁরই কাছে হাযির হয়। মানবী (সা) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্‌রকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এই মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্‌র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত উমর

কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেওয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই হযরত উমর ফারূকের কাছে গেল। ইহুদী লোকটি ফারূকে আযমের কাছে সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে বলল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযুর (সা)-ও করেছেন, কিন্তু এ লোকটি ১ম রায় মেনে নিতে পারেনি। ফলে মোকদ্দমা নিয়ে সে আপনার কাছে এসেছে।

হযরত উমর বিশ্‌রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন হযরত ফারুকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রসূল (সা)-এর ফয়সালা মানতে রাযী নয়, এই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা'লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল-মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সাধারণ তফসীরকাররা এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাফিকের ওয়ারিসরা হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়ত সিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটি মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত উমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি ঘটনার কথা বর্ণিত রয়েছে, যাতে কিছু লোক শরীয়তের মীমাংসা ছেড়ে কোন এক গণকের মীমাংসা গ্রহণ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। হয়তো বা আয়াতটি সেই সব ঘটনার প্রেক্ষিতেও অবতীর্ণ হয়ে থাকবে।

এবার আয়াতের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, সেই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, যে লোক দাবী করে যে, আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থরাজি--যেমন তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) আপনার উপর নাযিল হয়েছে, তার উপরও ঈমান এনেছি। অর্থাৎ পূর্বে ছিলাম আহলে কিতাব আর এখন হলাম মুসলমান। কিন্তু তার মুসলমান হওয়া সংক্রান্ত এ দাবীটি ছিল একান্তই মৌখিক; মনের দিক দিয়ে সে ছিল কুফ্‌রে পরিপূর্ণ। বিবাদ করতে গিয়ে সে বিষয়টি এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা)-কে বর্জন করে সে ইহুদী সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট যাওয়ার প্রস্তাব করে এবং মহানবী (সা) যখন ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করে দেন, তখন তা মানতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থে 'তাগূত' বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধীয় বিষয়টিকে কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়াকে শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা হয় এই কারণে যে, কা'ব নিজেই ছিল এক শয়তান কিংবা এই কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন

করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া, শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুত যে লোক সেই শিক্ষার অনুসরণ করেছে, সে শয়তানের কাছেই যেন নিজের মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে পথভ্রষ্টতার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের সময় রসূলে করীম (সা) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করবে, সে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাফিকের কাফির হওয়া কার্যত এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সা)-র মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারুকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাফিক থাকেনি, বরং প্রকাশ্য মুর্তাদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে---এরা এমন লোক, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রসূলের দিকে, তখন এসব মুনাফিক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

তৃতীয় আয়াতে ওয়ারিশানের সে সমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভ্রান্ততা প্রকাশ করা হয়েছে, যা শরীয়তসম্মত মীমাংসা পরিহার করে শরীয়তবিরোধী মীমাংসার প্রতি ধাবিত লোকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সংক্ষেপে তা ছিল এই যে, আমরা রসূলে করীম (সা)-কে না-হক বা ন্যায়বিরোধী মনে করে বর্জন করিনি এবং তাঁর মীমাংসার মোকাবিলায় অন্যের মীমাংসাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে গ্রহণ করিনি, বরং কোন কোন বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে এমনটি করেছি, যেমন আপনার নিকট হয়ে থাকে একান্ত আইনের মীমাংসা; কারো পক্ষপাতিত্বের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু আমরা বিষয়টি অপরের কাছে নিয়ে গিয়েছি, যাতে সে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন-একটা আপস-নিষ্পত্তির পথ বের করে একটা আপস করিয়ে দেয়।

এ সমস্ত ব্যাখ্যা তারা তখন উপস্থাপন করেছিল, যখন তাদের রহস্য প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মনের গোপন মুনাফিকী ও দুরভিসন্ধি ফাঁস হয়ে পড়ে এবং তাদের লোক হযরত উমর (রা)-এর হাতে নিহত হয়। সারকথা, তাদের দুষ্কর্মের ফলে যখন তাদের উপর অপমান ও হত্যাজনিত বিপদ এসে উপস্থিত হল, তখনই তারা কসম খেয়ে খেয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে আরম্ভ করে। সুতরাং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, এরা নিজেদের কসম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। এরা যা কিছু করেছে, তা একান্তই নিজের কুফরী ও মুনাফিকীর দরুন করেছে। বলা হয়েছে—যখন তাদের উপর নিজেদের অপকর্মের পরিণতিতে কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয় (যেমন, মুনাফিকীর বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ার দরুন অপদস্থতা কিংবা তার ফলে হত্যার ঘটনা ঘটে যাওয়া), এখন এরা আপনার নিকট এসে কসম খেয়ে বলে যে, মহানবী (সা) ব্যতীত অন্য কারো কাছে মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে হাযির হওয়া কুফরীর দরুন কিংবা হুযুর (সা)-এর মীমাংসাকে অন্যায় মনে করার কারণে ছিল না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল অনুগ্রহ ও কল্যাণ কামনা অর্থাৎ উভয় পক্ষের জন্য কোন কল্যাণের পথ অনুসন্ধান করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

চতুর্থ আয়াতে এরই উত্তর এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের মনে যে কুফরী ও মুনাফিকী রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত। তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কসম সর্বৈব মিথ্যা। কাজেই আপনি তাদের কোন আপত্তিই গ্রহণ করবেন না। হযরত উমর (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা দাবী উত্থাপন করছে, তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে দিন। কারণ, মুনাফিকের মুনাফিকী সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর বলা হয়েছে যে, এসব মুনাফিককেও আপনি সহানুভূতিপূর্ণ উপদেশ দান করুন, যা তাদের অন্তরে কার্যকর হতে পারে। অর্থাৎ তাদেরকে আখিরাতের ভীতি প্রদর্শনপূর্বক নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের আমন্ত্রণ জানান কিংবা পার্থিব শাস্তির কথা বলুন যে, তোমরা যদি মুনাফিকী বর্জন না কর, তাহলে কোন সময় এ মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তাতে তোমাদের পরিণতিও তাই হবে যা হয়েছে বিশ্বের।

পঞ্চম আয়াতে প্রথমত একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে রসূল পাঠিয়েছি, তা এজন্য পাঠিয়েছি, যাতে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে। অন্যথায় কেউ যদি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তার সাথে কাফিরসুলভ আচরণই করা হবে। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা) যে আচরণ করেছেন, তা সুস্পষ্ট। অতঃপর তাদেরকে সহানুভূতিপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি অপব্যাখ্যা ও কসমের আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিত এবং আপনার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং যদি রসূলে করীম (সা)-ও তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করে নিতেন।

এখানে তওবা কবূল হওয়ার জন্য হুযুর (সা)-এর নিকট হাযির হওয়া এবং মহানবী (সা) কর্তৃক মাগফিরাতের দোয়া করার শর্ত সম্ভবত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, তারা মহানবী (সা)-র নবুয়তী পদমর্যাদায়ও আঘাত হেনেছিল এবং তাঁর মীমাংসাকে উপেক্ষা করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। কাজেই তাদের তওবার জন্য হুযুর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিতি এবং হুযুর কর্তৃক তাদের মাগফিরাতের দোয়া শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়েছে।

এ আয়াতটি যদিও মুনাফিকদের বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শব্দাবলীর ভেতর থেকে একটি সাধারণ নিয়ম নির্গত হয়। তা হল, যে লোক রসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হবে এবং তিনি তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন, তার মাগফিরাত অবধারিত। বস্তুত রসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিতি যেমন তাঁর পার্থিব জীবনে হতে পারত, তেমনিভাবে বর্তমানে তাঁর রওযা মোবারকে উপস্থিতির হুকুমও একই রকম।

হযরত আলী (রা) বলেন, যখন আমরা রসূলে করীম (সা)-এর দাফন কার্য সমাপ্ত করে নিলাম, তার তিন দিন পর জনৈক গ্রামবাসী এলেন এবং কবরের নিকট এসেই পড়ে গেলেন এবং কেঁদে জার-জার হয়ে উল্লিখিত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগলেন,

"আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ওয়াদা করেছেন, যদি কোন গোনাহ্গার রসূলের খেদমতে হাযির হয় এবং রসূল যদি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন, তবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে। সেজন্যই আমি আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।" তখন যেসব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বর্ণনা হল এই যে, সে লোকের প্রার্থনার উত্তরে রওযা মোবারকের ভেতর থেকে একটি শব্দ বের হল قَدْ غُفِرَ لَكَ অর্থাৎ তোমাকে ক্ষমা করা হলো।---(বাহরে মুহীত)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

(৬৫) অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম ; সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে ! অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবূল করে নেবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর আপনার পালনকর্তার কসম (যারা শুধুমাত্র মুখে-মুখে ঈমান প্রকাশ করে, আল্লাহ্র নিকট) এরা ঈমানদার (বলে গণ্য) হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়ে এরা আপনার মাধ্যমে (এবং আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার শরীয়তের মাধ্যমে) মীমাংসা করবে। অতঃপর (আপনি যখন কোন মীমাংসা করে দেবেন, তখন) সে মীমাংসায় নিজের মনে (অস্বীকারজনিত) কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না, (এবং) এ মীমাংসাকে পরিপূর্ণভাবে (প্রকাশ্যে ও গোপনে) মেনে নেবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূল করীম (সা)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর ঃ এ আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর মহত্ত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সা)-র আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সা)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তাঁর কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহানবী (সা) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে-কোন বিবাদের মীমাংসার যিম্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানদের বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে।

তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের, মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (সা) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রসূল, রাহমাতুল্-লিল আলামীন ও উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটেন। কাজেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রসূলে মকবুল (সা)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেওয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা ঃ কোরআনের তাফসীরকাররা বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সা)-র যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কিয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবত থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকল্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমত সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূলে করীম (সা)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারুকে আযম (রা) সেই লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সা)-এর মীমাংসায় রাযী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা রসূলে করীম (সা)-এর আদালতে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুযুরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ما كنت اظنّ ان عمر يجترء على قتل رجل مؤمن অর্থাৎ আমার ধারণা ছিল না যে, উমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে)। এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের কাছে যদি কোন অধঃস্তন মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে তাঁকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সা) হযরত উমর (রা)-এর মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিন ছিলই না।

দ্বিতীয় মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, فِيمَا شَجَرَ

বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপর বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক।---(বাহ্‌রে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে পরস্পর বিবাদ পরিহার করে উভয় পক্ষকে

রসূলে করীম (সা)-এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে মীমাংসা অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।

তৃতীয় মাস'আলা ঃ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সা) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণত যে ক্ষেত্রে শরীয়ত তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহিযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রসূলে করীম (সা) অপেক্ষা কেউ বেশী পরহিযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সা) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়। সেজন্যই রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه-

"আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আযীমতের উপর আমল করায় খুশী হন, তেমনিভাবে রুখসত বা অব্যাহতির উপর আমল করলেও খুশী হন।"

সাধারণ ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার, দরূদ-তসবীহ্র ক্ষেত্রে সেই পন্থাই সর্বোত্তম, যা স্বয়ং হুযুর আকরাম (সা)-এর নিয়ম ছিল এবং তাঁর পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম যার উপর আমল করেছেন। হাদীসের প্রামাণ্য রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে সেগুলো জেনে নিয়ে সেই ভাবে আমল করাই মুসলমানদের অপরিহার্য কর্তব্য।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ বিগত বিশ্লেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসূলে করীম (সা) তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সংস্কারক এবং একজন নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যার সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফিক বিশ্রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসূলে করীম (সা)-এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ اطيعوا الله واطيعوا الرسول

"তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর।"

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ من يطع الرسول فقد اطاع الله

"যে রসূলের আনুগত্য করবে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে।"

এ আয়াতগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মহানবী (সা)-র শাসকোচিত মহত্ত্বও সুস্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়, যার কার্যকর দিক প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ্ তাঁর নিকট স্বীয় সংবিধান পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি উপস্থিত মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা তারই ভিত্তিতে করতেপারেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি ন্যায়পূর্ণ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের মাঝে এমন মীমাংসা করে দিতে পারেন, যেমন আল্লাহ্ আপনাকে দেখান এবং বুঝান।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

(৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেওয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আমি যদি (উদ্দিষ্ট হুকুম হিসাবে) মানুষের উপর এ বিষয়টি ফরয করে দিতাম যে, তোমরা আত্মহত্যা কর অথবা নিজেদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে গোনা কয়েকজন (পরিপূর্ণ মু'মিন ছাড়া) কেউই এ নির্দেশ পালন করত না। (এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনকারীর সংখ্যা অল্পই হয়)। আর যদি এসব (মুনাফিক) লোক (মনেপ্রাণে রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে) তাদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার উপর আমল করতে থাকত, তবে তাদের জন্য তা (পার্থিব জীবনে সওয়াবের যোগ্য হওয়ার দরুন তো) উত্তম হতই এবং (তদুপরি তা দীনের পরিপূর্ণতার দিক দিয়েও তাদের) ঈমানের পরিপক্কতা সাধনকারীও হত। (কারণ, অভিজ্ঞতার দ্বারা

একথা সপ্রমাণিত যে, দীনের কাজ করলে আত্মিক অবস্থা, বিশ্বাস ও ঈমানের উন্নতি সাধিত হয়)। আর এমতাবস্থায় (সৎকর্ম ও ধর্মের উপর দৃঢ়তা লাভ হয়ে গেলে পর আখিরাতে) আমি তাদেরকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে মহা প্রতিদানে ভূষিত করতাম এবং তাদেরকে আমি (জান্নাতের) সরল পথ প্রদর্শন করতাম (যাতে তারা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, যা মহান প্রতিদান অর্জনের স্থান)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযূল ঃ যে ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, তা ছিল মুনাফিক বিশ্‌র-এর ঘটনা। সে তার বিবাদের মীমাংসার জন্য কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়। আর হুযুরে আকরাম (সা)-এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশ্বস্ত না হয়ে বরং পুনর্বার মীমাংসা করার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ধিক্কার দিতে লাগল যে, তোমরা কেমন মানুষ; যাকে তোমরা রসূল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না! ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের তওবাকল্পে তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সত্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদের যদি এমন কোন হুকুম দেওয়া হত, তবে তোমরা কি করতে? এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ——অর্থাৎ এ সমস্ত মুনাফিক কিংবা কাফির ও মু'মিন নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের এমনি অবস্থা যে, তাদেরকে যদি বনী ইসরাঈলের মত আত্মহত্যা কিংবা দেশত্যাগের কঠিন কোন নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে তাদের খুব অল্প লোকই তা পালন করত।

এতে সেসব লোকের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা শরীয়তকে ত্যাগ করে অন্য কোন দিকে নিয়ে যায়।

তাছাড়া এতে উল্লিখিত ঘটনা প্রসঙ্গে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে যে ধিক্কার দিয়েছিল, তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে। তা এভাবে যে, এই অবস্থা মুনাফিকদেরই হতে পারে, খাঁটি মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে-কিরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন করেন নি। সাহাবীর এ বাক্যটি রসূলে করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।" ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে দিতাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আয়াত নাযিল হলে রসূলে করীম (সা) বললেন, যদি আত্মহত্যা কিংবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েই যেত, তবে 'উম্মে আব্‌দ' অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) অবশ্যই এর উপর আমল করতেন। অবশ্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, এ কাজটি যদিও কঠিন, কিন্তু যদি তারা আমার নির্দেশানুযায়ী তা মেনে নেয়, তবে ফলত এটাই হবে তাদের জন্য উত্তম। আর এ আমলটি তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেবে। বস্তুত এতে আমি তাদেরকে মহা সওয়াব দান করব এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। আর তার সবিস্তার বিশ্লেষণ হ'ল আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের চারটি স্তর, যাঁদের সম্পর্কে এতে আলোচনা করা হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এবং জান্নাতে তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে আলোচনা হবে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৭০) এটা হল আল্লাহ্-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ্ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যে লোক (প্রয়োজনীয় হুকুম-আহ্‌কামের ক্ষেত্রেও) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করবে (পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে পরাকাষ্ঠা অর্জন করতে না পারলেও) এ ধরনের লোক (জান্নাতের মাঝে) যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা (ধর্মীয়) নেয়ামত (স্বীয় সান্নিধ্য ও নৈকট্য) দান করেছেন সেই সব মহান ব্যক্তির সাথে থাকবে অর্থাৎ আম্বিয়া (আ) সিদ্দিকীন, (যারা নবী-রসূলদের উম্মতের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন;

যাদের মধ্যে থাকে যথার্থ আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা এবং পরিভাষাগতভাবে যাদেরকে বলা হয় আউলিয়া) এবং শহীদ (যারা দীনের মুহাব্বতে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছেন) আর সালেহীন (যারা পরিপূর্ণভাবে শরীয়তের অনুসারী ওয়াজেবাতের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা মুস্তাহাব বিষয়েই হোক এবং যাদেরকে বলা হয় নেককার দীনদার) বস্তুত এসব মহান লোক (যাদের সঙ্গী হবেন) অতি উত্তম সঙ্গী। (তাদের সাথে অনুগত ভক্তদের সান্নিধ্য প্রমাণিতও রয়েছে কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, এহেন সঙ্গী পাওয়াটাই হল ইবাদতের ফসল। সেই সব মহান ব্যক্তির এই সান্নিধ্য লাভ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। (অর্থাৎ এটা কোন আমলের প্রতিদান নয়। কারণ, মর্যাদার দিক দিয়ে সৎকর্মের মর্যাদাই ছিল এর চাহিদা, যাকে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ।) আর আল্লাহ্ প্রতিটি আমলের চাহিদা এবং সে চাহিদার অতিরিক্ত অনুগ্রহের যোগ্য পরিমাণ সম্পর্কে) উত্তম ভাবেই পরিজ্ঞাত। (কারণ এ অনুগ্রহের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান—অনেকে বারবার তাঁদের সান্নিধ্য অর্জন করবে আবার অনেকে কদাচ সান্নিধ্যে আসবে।)

যোগসূত্র ঃ উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের দরুন বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে। এখন বর্তমান আয়াতগুলোতে একটি সাধারণ মূলনীতি হিসেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের জন্য সাধারণ প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ঃ সেই সমস্ত লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রসূলদের সাথে জান্নাতের উচ্চতর জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের নবীদের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় সিদ্দিকীন অর্থাৎ তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরাম, যারা কোনরকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবূ বকর (রা) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সেই সমস্ত লোককে বলা হয়, যারা আল্লাহ্‌র রাহে নিজেদের জান মাল কোরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুত সালেহীন হলেন সেই সব লোক, যারা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সৎকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দারা সে সমস্ত মহান ব্যক্তির সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। তাঁরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) আম্বিয়া (আ) (২) সিদ্দিকীন (৩) শুহাদা (৪) সালেহীন।

শানে নযুল ঃ এ আয়াত বিশেষ একটি ঘটনার ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমামে-তফসীর হাফেয ইবনে কাসীর একাধিক সনদে তা উদ্ধৃত করেছেন।

ঘটনা এই যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন জনৈক সাহাবী রসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার অন্তরে আপনার মুহাব্বত আমার নিজের জান, নিজের স্ত্রী ও নিজের সন্তান-সন্ততির চাইতেও অধিক। অনেক সময় আমি নিজের ঘরে অস্থির হয়ে পড়ি। যতক্ষণ না আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আপনাকে দেখে নেই ততক্ষণ স্বস্তি লাভ করতে পারি না। কাজেই আমার চিন্তা হয়, আপনি যখন এ পৃথিবী থেকে তিরোহিত হয়ে যাবেন এবং আমিও যখন মরে যাব, তখন আমি জানি, আপনি নবী-রসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন অথচ প্রথমত আমি জানি না, আমি জান্নাতে পৌঁছাব কিনা। আর যদি পৌঁছাইও, তবে আমার মর্যাদা আপনার চাইতে বহু নীচে হবে, সেখানে আমি আপনার সান্নিধ্য হয়তো পাব না। তখন কেমন করে আমি সবর করব ?

তাঁর কথা শোনার পর রসূলে করীম (সা) কোন উত্তর দিলেন না। ইতিমধ্যে আলোচ্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ -

অতঃপর মহানবী (সা) তাঁকে (উল্লিখিত সাহাবীকে) সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, যারা আনুগত্যশীল তাঁরা জান্নাতের মধ্যে নবী-রসূল, সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালেহীনগণের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ জান্নাতের উচ্চতর মর্যাদা ও সম্মানের পার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসার সুযোগ লাভ হবে।

জান্নাতে দেখা-সাক্ষাতের কয়েকটি দিক ঃ (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক, গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাত-বাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জারীর (রা) হযরত রাবী (রা) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সা) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সা) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত কা'ব ইবনে আসলামী রাতের

বেলায় মহানবী (সা)-র সঙ্গে থাকতেন। কোন এক রাতে তাহাজ্জুদের সময় কা'ব আসলামী (রা) হুযুর (সা)-এর জন্য অযুর পানি ও মিসওয়াক প্রভৃতি দরকারী জিনিস তৈরী করে রাখলে তিনি খুশী হয়ে বললেন, 'বল, কি তুমি কামনা কর?' কা'ব নিবেদন করলেন, 'আমি বেহেশতে আপনার সান্নিধ্য কামনা করি।' হুযুর (সা) বললেন আর কিছু? তখন তিনি নিবেদন করলেন। আর কিছু নয়। এতে মহানবী (সা) ইশরাদ করলেন, তুমি যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে أعنى على نفسك بكثرة السجود অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তুমিও সর্বাধিক সিজদার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো; অর্থাৎ বেশী করে নফল নামায আদায় করো।

মসনদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি লোক এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আপনি আল্লাহ্র সত্য রসূল আর আমি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযও নিয়মিত পড়ি, যাকাতও দেই এবং রমযানের রোযাও রাখি। এ কথা শুনে হুযুরে আকরাম (সা) বললেন, 'যে লোক এমনি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। তবে শর্ত হল, সে যদি নিজের পিতা-মাতার সাথে নাফরমানী না করে।'

তেমনিভাবে তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সা) বলেছেন ঃ

التاجر الصدوق الامين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء

অর্থাৎ সত্যবাদী আমানতদার এবং ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত ঃ হুযুরে আকরাম (সা)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মুহাব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ্ বুখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতেরায় সাহাবায়ে কিরামের এক বিপুল জামা'আত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে ঃ রসূলে করীম (সা)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামা'আত বা দলের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এ দলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি? হুযুর (সা) বললেন, المرأ مع من احب অর্থাৎ হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি, যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ এ হাদীসে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাঁদের গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হুযুরের সাথেই থাকবেন।

রসূলে করীম (সা)-এর সান্নিধ্য লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় ঃ তেবরানী (র) 'মু'জামে কবীর' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সা)-র দরবারে এসে নিবেদন

করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি ও রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব?'

মহানবী (সা) বললেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সেই সত্তার কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রঙের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' (কলেমা)-য় বিশ্বাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহ্র দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক 'সুবহানাল্লাহ্ ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।"

একথা শুনে মজলিসের ভেতর থেকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যখন কল্যাণ দানের এমন উদারতা, তখন আমরা কেমন করে ধ্বংস হতে পারি! অথবা আযাবেই বা কেমন করে গেরেফতার হতে পারি? মহানবী (সা) বললেন, (কথা তা নয়) কিয়ামতের দিন কোন কোন লোক এত অধিক আমল ও নেকী নিয়ে আসবে যে, সেগুলোকে যদি পাহাড়ের উপরে রেখে দেওয়া হয়, তবে পাহাড়ও তার চাপ সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু এগুলোর সাথে যখন আল্লাহ্র করুণা ও নিয়ামতসমূহের তুলনা করা হয়, তখন সব আমলই নিঃশেষিত হয়ে যায় যদি না আল্লাহ্ তাকে স্বীয় রহমতে আশ্রয় দান করেন।

এই হাবশীর সওয়াল-জওয়াবের ভিত্তিতেই সূরা 'দাহর' এর আয়াত ঃ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا -

নাযিল হয়। হাবশী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার চোখ যেসব নিয়ামত দেখবে, আমার চোখও কি সেগুলো দেখতে পাবে?

হুযুর (সা) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই দেখবে। একথা শুনে নও-মুসলিম এই হাবশী কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন এবং হুযুরে আকরাম (সা) স্বহস্তে তাঁর দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন।

মর্যাদার বিশ্লেষণ ঃ শানে নযুলসহ আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় থেকে যাচ্ছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের মর্যাদার যে চারটি স্তর বর্ণনা করা হয়েছে, তা কোন্ দিক দিয়ে এবং এগুলোর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য কি এবং এ চারটি স্তরই কোন এক ব্যক্তিত্বে একত্রিত হতে পারে কি না?

মুফাসসিরীন মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করেছেন। কোন কোন মনীষী বলেছেন, এ চারটি বৈশিষ্ট্য একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে এবং এসবগুলোই পারস্পরিক অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য। কারণ, কোরআনে যাঁকে নবী বলা হয়েছে তাঁকে সিদ্দীক প্রভৃতি পদবীও দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা

হয়েছে ঃ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই সত্যবাদী নবী ছিলেন)।

তেমনিভাবে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ (আর তিনি ছিলেন সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত নবী)। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمِنَ الصَّٰلِحِينَ (অর্থাৎ তিনিও সালেহীনগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)।

এর মর্ম এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যদিও এই চারটি গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং স্তরই পৃথক পৃথক; কিন্তু এ চারটি গুণই এক ব্যক্তিতে একত্রিত হতে পারে। যেমন মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, মুওয়াররিখ ও মুতাকাল্লিম প্রমুখ ওলামার পৃথক পৃথক গুণ-বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন একজন আলিম এমনও হতে পারেন যিনি মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুওয়াররিখ ও মুতাকাল্লিমও হবেন। অথবা যেমন, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈমানিকতা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা দিক। কিন্তু এসবগুলোই কোন একজনের মধ্যেও একত্রিত হতে পারে।

অবশ্য সাধারণ রীতি অনুযায়ী যার মধ্যে যে গুণের প্রবলতা বিদ্যমান থাকবে, তাকে সে নামেই অভিহিত করা হয় এবং তিনি সে বৈশিষ্ট্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যারা গ্রন্থ রচনা করেন তারা তাঁকে সে মানের আওতায়ই গণ্য করেন। সে কারণেই তফসীরবিদ আলিমগণ বলেছেন, 'সিদ্দিকীন'-এর অর্থ হল অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন; সাহাবী আর শুহাদা অর্থ হল, সেই সব সাহাবী যাঁরা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর 'সালেহীন' অর্থ সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান।

ইমাম রাগেব (র) এই শ্রেণী চতুষ্টয়কে পৃথক পৃথক শ্রেণী বা মর্যাদার পৃথক পৃথক স্তর হিসাবে গণ্য করেছেন। তফসীরে বাহ্রে মুহীত, রূহুল মা'আনী ও মাযহারীতেও তা-ই উল্লিখিত রয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'মুমিনদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য উচ্চ ও নিম্ন মর্যাদা স্থির করে দিয়েছেন। আর সাধারণ মুসলমানদের উৎসাহদান করা হয়েছে, তারা যেন মর্যাদায় কোনক্রমেই পেছনে না থাকে। ইল্ম ও আমল তথা জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে যেন এসব স্তরে গিয়ে পৌঁছার চেষ্টা করে। তবে নবুয়ত এমন একটি স্তর যা চেষ্টার মাধ্যমে কেউ লাভ করতে পারে না, তবে নবীদের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হতে পারে। ইমাম রাগেব (র) বলেছেন, এসব স্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম স্তর হল ঐশী শক্তির সাহায্যপ্রাপ্ত নবী-রসূলদের স্তর। তাদের উদাহরণ হল এমন, যেন কোন লোক কাছে থেকে দেখছে। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা ঃ দ্বিতীয় স্তর হল সিদ্দিকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সেই সমস্ত লোক, যারা মা'রেফত বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীদের

কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রা)-র কাছে কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, "আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন?' তিনি বলেছিলেন, "আমি এমন কোন কিছুর ইবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।" অতঃপর আরো বললেন, "আল্লাহ্‌কে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাকে উপলব্ধি করে নেয়।" এখানে দেখা বলতে হযরত আলী (রা)-র উদ্দেশ্য হল স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখারই মত উপলব্ধি করে নেওয়া।

শহীদের সংজ্ঞা ঃ তৃতীয় স্তর হল শহীদের। আর শহীদ হলেন সেই সমস্ত লোক, যারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হল এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন হযরত হারিসা (রা) বলেছেন, "আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।"

তাছাড়া ان تعبد الله كانك تراه হাদীসটিতেও এমনি ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীনের সংজ্ঞা ঃ চতুর্থ স্তর হল সালেহীনের যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে যে وان لم تكن تراه فانه يراك বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর এই পর্যালোচনার সারনির্যাস হচ্ছে এগুলোই হল 'মা'রেফতে রব' বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুত এই মা'রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদাও বিভিন্ন। যা হোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট যে, এতে মুসলমানদের এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীরা তাঁদেরই সাথে থাকবে যারা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান কর। আমীন!

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا
جَمِيْعًا ﴿٧١﴾ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ
قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ
فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ

يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

(৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ এলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে,) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহ্র কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুত যারা আল্লাহ্র রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (কাফিরদের মুকাবিলায়) নিজেদেরকে সতর্ক রাখ (অর্থাৎ তাদের আক্রমণ বা ষড়যন্ত্র থেকেও সতর্ক থাকবে এবং মোকাবিলার সময় আসবাবপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার প্রভৃতি নিয়েও তৈরী থাকবে)। অতঃপর (তাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য) পৃথক পৃথকভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে (যেমনি সুযোগ পাওয়া যায়) বেরিয়ে যাও এবং তোমাদের দলে (যেমন কিছু কিছু মুনাফিকও এসে ঢুকছে তেমনি) এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা (জিহাদে অংশগ্রহণ করে না) সরে থাকছে (এতে মুনাফিকদেরই বোঝানো হয়েছে)। তোমরা যদি (পরাজয় প্রভৃতি) কোনরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হও, তবে তারা (নিজেদের অজ্ঞতার দরুন আনন্দিত হয়ে) বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে) উপস্থিত হইনি। (তা নাহলে যে আমার উপরও এমনি বিপদ আসত)। পক্ষান্তরে তোমাদের উপর যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হয় (অর্থাৎ তোমরা যদি বিজয় ও গনীমত অর্জন কর, তবে তারা) এমন (স্বার্থপর) ভাবে (আক্ষেপ করতে আরম্ভ করে,) যেন তোমাদের ও তাদের মাঝে কোন সম্পর্কই নেই। (বিজিত জিহাদে অংশগ্রহণ না করার দরুন গনীমতের মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আক্ষেপ করে) বলে, হায়, কতই না ভাল হত যদি আমিও সে লোকদের সাথে (জিহাদে গিয়ে) অংশীদার হয়ে পড়তাম! তাহলে আমিও যে বড়ই কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারতাম। (ধন-সম্পদ আমারও হস্তগত হত। এহেন উক্তিতে তাদের স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়। তা না হলে যার সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে মানুষ তার কৃতকার্যতায়ও খুশী হয়। পাল্টা আফসোস-অনুতাপে প্রবৃত্ত হবে এবং এতটুকু

আনন্দ প্রকাশ করবে না--তা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা এমনি ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, মহান কোন সফলতা সহজেই আসে না। যদি কেউ তার অন্বেষণকারী হয়ে থাকে,) তবে তাঁর উচিত হচ্ছে, আল্লাহ্র রাহে (আল্লাহ্র বাণীর প্রচার প্রসারের নিয়তে, যা ঈমান ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ নিঃস্বার্থে মুসলমান হয়ে) সে সমস্ত (কাফির) লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, যারা আখিরাতকে পরিহার করে তার পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে অবলম্বন করেছে অর্থাৎ কারও যদি মহান কৃতকার্যতার সাধ থাকে, তাহলে তাকে বিশুদ্ধ মানসিকতার সাথে হস্তপদ সঞ্চালন তথা কষ্ট সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে এবং তলোয়ার ও বর্শার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে হবে। আর তাহলেই দেখবে সফলতা তার পদ চুম্বন করছে। বস্তুত এটা কি কোন খেলার কথা? যে লোক এমনি বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারবে, সেই পাবে মহান সফলতা। কারণ, পার্থিব কৃতকার্যতা তো একান্তই তুচ্ছ বিষয়! কখনও আছে তো কখনও নেই। বিজয় অর্জন করতে পারলেই তা হাতে আসে আর পরাজিত হলেই তা চলে যায়। পক্ষান্তরে আখিরাতের সফলতা উল্লিখিত বিশিষ্ট লোকদের জন্যই প্রতিশ্রুত! তা যেমনি মহান, তেমনি চিরস্থায়ী। কারণ, তাঁর রীতি হল এই যে, যে লোক আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করবে, তাতে সে (পরাজিত হয়ে) নিহতই হোক অথবা বিজয়ই অর্জন করুক, আমি সর্বাবস্থায় তাকে (আখিরাতের) সুফল দান করব (যা যথার্থই মহান কৃতকার্যতা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য)।

যোগসূত্রঃ ইতিপূর্বে ছিল আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ বিষয়ক আলোচনা। অতঃপর পরবর্তী এ আয়াতসমূহে অনুগত বান্দাদের প্রতি দীনের প্রসার ও আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।---(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

কতিপয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য

আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا -

অর্থাৎ "হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ্ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেন নি।"

১. এ আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ এবং অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثُبَاتٍ শব্দটি ثُبَةٌ—এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

এ শিক্ষা মুসলমানদেরকে জিহাদ চলাকালীন সময়ের জন্য দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু স্বাভাবিক সময়ের জন্যও ইসলামের শিক্ষা হল এই যে, সফর করতে হলে একা সফর করবে না। সুতরাং এক হাদীসে একা সফরকারীকে একটি শয়তান, দু'জন সফরকারীকে দু'টি শয়তান এবং তিন জন মুসাফিরকে একটি দল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خير الصحابة اربعة وخير السرايا اربع مائة وخير الجيوش اربعة الاف ০

অর্থাৎ "উত্তম সাথী হল চার জন, উত্তম সৈন্যদল হলো চারশো জনের এবং উত্তম সৈন্যবাহিনী হল চার হাজারের বাহিনী।

২. وَاِنَّ مِنْكُمْ আয়াতের দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানেও মু'মিনদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ এ প্রসঙ্গে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা মু'মিনদের গুণাবলী হতে পারে না। কাজেই আল্লামা কুরতুবী বলেছেন যে, এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু তারাও প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী করছিল, সেহেতু তাদেরকেও মু'মিনদেরই একটি দল বা জামা'আত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

(৭৫) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহ্‌র রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষাবম্বলনকারীদের বিরুদ্ধে—(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের এমন কি অজুহাত থাকতে পারে যার কারণে তোমরা জিহাদ করবে না (পক্ষান্তরে এর জন্য বলিষ্ঠ যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, এ জিহাদ হবে) আল্লাহ্‌র রাহে (আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য যার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য)। আর (আল্লাহ্‌র এই বিধান প্রতিষ্ঠার নিদর্শনসমূহের একটি বিশেষ নিদর্শনও এইক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। আর তা হল এই যে,) যারা দুর্বল, (ঈমানদার) তাদের পক্ষে (লড়াই করাও কর্তব্য, যাতে তারা কাফিরদের অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে) যাদের মাঝে রয়েছে কিছু পুরুষ, কিছু নারী এবং কিছু শিশু যারা (কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে) ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের (কোন প্রকারে) এই জনপদ থেকে (অর্থাৎ মক্কা নগরী থেকে, যা আমাদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়ে পড়েছে) বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা অতি নিষ্ঠুর-অত্যাচারী। (এরা যে আমাদেরকে জর্জরিত করে তুলছে)। আর (হে আমাদের পরওয়ারদেগার,) আমাদের জন্য গায়েবী কোন পক্ষাবলম্বনকারী পাঠাও (যিনি এই অত্যাচারী জালিমদের কবল থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবেন)। যারা যথার্থই পূর্ণ ঈমানদার (তারা তো এসব বিধান শোনে) আল্লাহ্‌র রাহে (অর্থাৎ ইসলামের বিজয়কল্পে) জিহাদে ব্রতী হয়, পক্ষান্তরে (তাদের বিপরীতে) যেসব কাফির রয়েছে, তারা লড়াই করে শয়তানের পথে। (অর্থাৎ কুফরীকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, এতদুভয় দলের মধ্যে তারাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে, যারা হবে ঈমানদার। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষেই যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য রয়েছে,) তখন (হে ঈমানদারগণ,) তোমরা শয়তানের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য হতে বঞ্চিত কাফিরদের বিরুদ্ধে) জিহাদ করে

যাও। (আর তারাও অজস্র বিজয় অর্জনের নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে, কিন্তু) প্রকৃতপক্ষে (সেগুলো হল শয়তানী ব্যবস্থা। শয়তানই যে তাদেরকে কাফিরী ব্যবস্থার নির্দেশ দিচ্ছে)। বস্তুত শয়তানী ব্যবস্থাবলী সবই হয়ে থাকে দুর্বল (কারণ, এতে খোদায়ী কোন সাহায্য-সহায়তা থাকে না। অবশ্য সামান্য কয়েক দিনের জন্য তাদের বিজয় হয়ে গেলেও প্রকৃত-পক্ষে তা সাময়িকভাবে তাদেরকে অবকাশ দেওয়ারই নামান্তর। কাজেই যারা খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত মু'মিন, তাদের সাথে তারা কি মোকাবিলা করতে পারে?)

সারমর্ম হল এই যে, জিহাদ করার পক্ষে যখন যথার্থ কারণও রয়েছে এবং খোদায়ী সাহায্য-সহায়তার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, তার পরেও তোমাদের জিহাদ করতে কি এমন আপত্তি থাকতে পারে? কাজেই এখানে পুনরায় তাকীদ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ঃ মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যাঁরা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফিররাও তাঁদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করছিল, যাতে তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সাল্লামাহ্ ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবূ জানদাল ইবনে সাহ্ল প্রমুখ।---(কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফিরদের অসহনীয় উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদের নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জিহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদের কাফিরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মু'মিনরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দুটি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদের এই (মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ্ তাঁদের দুটি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রসূলে মকবুল (সা) ইতাব ইবনে উসায়েদ (রা)-কে ঐসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি ঐসব উৎপীড়িতদের অত্যাচারীদের উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জিহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে مَا لَكُمْ

لَا تُقَاتِلُوْنَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভাল মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা সর্ব বিপদের অমোঘ প্রতিকার ঃ يَقُوْلُوْنَ

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জিহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানদের জিহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপদাপদ শেষ হয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে মু'মিন ও কাফিরের উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা ঃ اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ

فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মু'মিন বা ঈমানদার, তারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌র পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যত মু'মিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ্‌ই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য যাকে আল্লাহ্‌র কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মু'মিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফির তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফিররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা ঃ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল ও ভঙ্গুর। ফলে তা মু'মিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতএব, মুসলমানদের শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলা-কৌশল কাফিরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

বস্তুত 'বদর' যুদ্ধে তাই হয়েছে। প্রথমে শয়তান কাফিরদের সামনে দীর্ঘ বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে তাদেরকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ (অর্থাৎ আজকের দিনে তোমাদের কোন শক্তিই পরাজিত করতে পারবে না! কারণ, إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ আমি তোমাদের সাহায্যকারী)। আমি আমার সমস্ত বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসব।---যুদ্ধ আরম্ভ হলে শয়তান নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এলোও বটে, কিন্তু যখন সে দেখতে পেল, মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা (বাহিনী) এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন সে যাবতীয় কলা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে দেখেই পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল এবং স্বীয় বন্ধু কাফিরদের লক্ষ্য করে বলল ঃ

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

(আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। কারণ, আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখতে পাও না অর্থাৎ ফেরেশতাবাহিনী)! আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। তার নিগড় (অত্যন্ত) কঠিন।---(মাযহারী)

এ আয়াতে শয়তানের কলা-কৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দুটি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলা-কৌশল অবলম্বন করবে তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না! প্রথম শর্ত الَّذِينَ آمَنُوا বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এদু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলা-কৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "তোমরা যদি শয়তানকে দেখ, তাহলে নির্দ্বিধায় তাকে আক্রমণ কর।" অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا - (আহ্‌কামুল-কোরআন, সুয়ূতী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ
كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۣ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧٧﴾
اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَاِنْ
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ﴿٧٨﴾ مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ
اللّٰهِ ۘ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۗ وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ
رَسُوْلًا ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٧٩﴾

(৭৭) তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল যেমন করে ভয় করে আল্লাহ্‌কে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না! (হে রসূল,) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখিরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই—যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও! বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে; আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও; এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে; যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না! (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ্ সব বিষয়েই যথেষ্ট—সব বিষয়েই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা কি সে সমস্ত লোককে দেখনি, (জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে যাদের মাঝে যুদ্ধের বিপুল আগ্রহ ছিল যে,) তাদেরকে (যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য) বলতে হয়েছিল, (এ মুহূর্তে) নিজের হাতকে সংযত রাখ এবং নামাযের অনুবর্তিতা করতে থাক এবং যাকাত (প্রভৃতি বিষয়ে যেসব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো) সম্পাদন করতে থাক। (যাদের অবস্থা এই ছিল,) তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করা হলে অবস্থা এমন হল যে, তাদের মধ্যে অনেকে (বিরোধী) লোকদেরকে (স্বভাবত) এমনভাবে ভয় করতে লাগল (যেন তারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে), যেমন ভয় করা হয় আল্লাহ্‌কে। বরং তারও চাইতে অধিক ভয়। (অধিক ভয়ের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সাধারণত আল্লাহ্‌কে যে ভয় করা হয়, তা হয় যুক্তিগত। আর শত্রুর যে ভয়, তা হয় প্রকৃতিগত। আর প্রকৃতিগত অবস্থা যুক্তিগত অবস্থার তুলনায় কঠিন হওয়াটাই হল সাধারণ নিয়ম। দুই, আল্লাহ্‌র প্রতি যেমন ভয় থাকে, তেমনি থাকে রহমতের আশা। পক্ষান্তরে কাফির শত্রুর কাছে শুধু অনিষ্টের ভয় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর যেহেতু তাদের এই ভয়টি ছিল প্রকৃতিগত, কাজেই তাতে কোন পাপের কারণ ছিল না।) আর (তারা জিহাদের এ নির্দেশ মুলতবি করার আশায়) বলতে লাগল, (তা একথা বলা মুখেই হোক কিংবা মনে মনেই হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানে মৌখিক ও আন্তরিক কথা একই সমান) হে আমাদের পালনকর্তা! এখন থেকেই কেন আপনি আমাদের উপর জিহাদ ফরয করলেন, আমাদেরকে (স্বীয় অনুগ্রহে) আরও কিছুটা সময়ের জন্য অবকাশ দিতে পারতেন। (তাতে আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করে নিতে পারতাম বস্তুত এই নিবেদন করাটা যেহেতু আপত্তি কিংবা অস্বীকৃতিমূলক নয়, কাজেই এতে কোন পাপের কারণ নেই। পরবর্তীতে উত্তর দেওয়া হচ্ছে যে, হে মুহাম্মদ) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন, যে পার্থিব কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে (তোমরা অবকাশ কামনা করছ,) তা একান্তই ক্ষণস্থায়ী। আর আখিরাত হল সর্বপ্রকারেই উত্তম (যা অর্জন করার উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জিহাদ। কিন্তু তা) সে সমস্ত লোকের জন্যই (নির্ধারিত), যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার আহ্‌কামের বিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকবে। (ফলে, কুফরীর মাধ্যমে যদি বিরোধিতা করা হয়, তাহলে তার জন্য আখিরাতের কোন উপকরণই থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি পাপের মাধ্যমে বিরোধিতা হয়ে থাকে, তাহলে আখিরাতে উচ্চমর্যাদালাভে বঞ্চিত হতে হবে)। আর তোমাদের প্রতি সামান্যতম অন্যায়ও করা হবে না। (অর্থাৎ যে পরিমাণ আমল থাকবে তদনুপাতে সওয়াব বা পুণ্য দান করা হবে। কাজেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথচ জিহাদে অংশগ্রহণ না করলেও কি নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে? কখনও নয়! কারণ, মৃত্যুর অবস্থা হলো এই যে,) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু সেখানেই এসে চেপে বসবে। (এমন কি) যদি (কোন) সুদৃঢ় দুর্গের মাঝেও অবস্থান কর (তবুও তা থেকে অব্যাহতি পাবে না) সারকথা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং মরে গিয়ে যখন পৃথিবীকে ছাড়তেই হবে, তখন আর আখিরাতে শূন্য হাতে যাবে কেন। বরং বুদ্ধির কথা হল এই যে—

چند روزے جہد کن باقی بخند۔

(সামান্য কয়দিন কষ্ট করে বাকী সময় আনন্দের ব্যবস্থা কর) আর যদি এসব (মুনাফিক) লোকের (যুদ্ধে বিজয় প্রভৃতি) কোন কল্যাণ সাধিত হয়, তবে বল যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (দৈবাত) হয়ে গেছে। (তা না হলে মুসলমানদের বিশৃঙ্খলায় কোন কমতিই ছিল না।) আর যদি তারা কোন অকল্যাণের সম্মুখীন হয় (যেমন যুদ্ধে পরাজয় বরণ প্রভৃতি), তবে (হে মুহাম্মদ, আপনাকে লক্ষ্য করে) বলে যে, এমনটি আপনার (এবং মুসলমানদের বিশৃঙ্খলার) কারণেই ঘটেছে। (শান্তিমত ঘরে বসে থাকলে কি আর এহেন বিপদে পড়তে হত? আপনি বলে দিন, (এ ব্যাপারে আমার যে সামান্যও হাত নেই। নিয়ামতই হোক, আর বিপদাপদই হোক সবই যে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে। (অবশ্য) একটা আসে প্রত্যক্ষ এবং আরেকটা আসে পরোক্ষ। এর বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিয়ামত আসে সরাসরি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে। কোন আমলের মাধ্যমে নয়। আর বিপদাপদ আসে মানুষের অসৎ কর্মের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ন্যায়-বিচারালয় থেকে। সুতরাং তোমরা যে বিপদাপদে আমার হাত রয়েছে বলে মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তাতে তোমাদের কর্মেরই দখল রয়েছে। যেমন, ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ-উপকরণ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর এ আয়াতটি একান্তই সুস্পষ্ট ---মানুষ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, যে কোন মঙ্গলাবস্থার পূর্বে সে পর্যায়ের কোন নেক আমল সে খুঁজে পাবে না যাতে এহেন মঙ্গল লাভ হতে পারে। কাজেই মঙ্গল লাভ যে একান্তই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষের অমঙ্গল কিংবা কোন দুরবস্থার পূর্বে এমন কোন অসৎ কর্ম অবশ্যই থাকবে, যার শাস্তি তদপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত ছিল। কাজেই এটা যখন অতি স্পষ্ট বিষয়) তখন সে (নির্বোধ) লোকগুলির কি হল যে, তারা বিষয়টি উপলব্ধি করার ধারেকাছেও যাচ্ছে না! (তা ছাড়া বুঝবে যে কি---তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে,) তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (তারই অনুগ্রহে) সাধিত হয়েছে। আর তোমাদের যেসব অকল্যাণ ও দুরবস্থা উপস্থিত হয়, সেগুলো (তোমাদেরই অসৎ কর্মের) কারণে হয়ে থাকে। (অতএব, এ সমস্ত অমঙ্গল ও দুরবস্থাকে শরীয়ত নির্ধারিত বিধি-বিধানের উপর আমল করার ফল বলে অভিহিত করা কিংবা শরীয়ত নির্ধারকের পক্ষ থেকে আগত বলে মনে করা সম্পূর্ণভাবে মূর্খতা। যেমন, মুনাফিকরা এসব অমঙ্গলকে জিহাদ অথবা জিহাদের আমীরের প্রতি সম্পৃক্ত করত)। আর আমি আপনাকে মানুষের জন্য পয়গম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। (কোন মুনাফিক ও কাফির যদি অস্বীকারও করে তাতে নবুয়ত কেমন করে অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে পারে। কারণ) আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য (রিসালতের স্বাক্ষী হিসাবে) যথেষ্ট। যিনি কার্যকরভাবে এবং কথার মাধ্যমে স্বাক্ষ্য দিয়েছেন বাচনিক সাক্ষীর উদাহরণ হল وَأَرْسَلْنَاكَ বলা। আর কার্যকর সাক্ষ্য হল রসূলের মো'জেযাসমূহ, যা নবুয়তের দলীলস্বরূপ আপনাকে দান করা হয়েছে)।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নযুল ঃ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.....মক্কায়

হিজরত করার পূর্বে কাফিররা মুসলমানদের প্রতি কঠিন নিপীড়ন চালাচ্ছিল। এতে মুসলমানরা মহানবী (সা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করতেন এবং কাফিরদের মোকাবিলা করার অনুমতি চাইতেন অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু হুযূর (সা) তাদেরকে এই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতেন যে, 'আমার প্রতি মোকাবিলা করার কোন নির্দেশ হয়নি। বরং ধৈর্য ধারণ করার এবং ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে।' তিনি আরও বলতেন, "নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার যে নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই যথারীতি সম্পাদন করতে থাক। কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য নিজেদের মনের সাথে জিহাদ করতে এবং দৈহিক কষ্ট সহিষ্ণুতায় আল্লাহ্‌র রাহে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা এবং আল্লাহ্‌র রাহে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়।" মুসলমানরা হুযুর (সা)-এর এ কথাগুলো হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই অতঃপর হিজরতোত্তরকালে যখন জিহাদের নির্দেশ হল, তখন তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের আবেদন এবার গৃহীত হলো। কিন্তু কোন কোন অপরিপক্ক মুসলমান কাফিরদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে এমন ভয় করতে লাগলেন, যেমন ভয় করা উচিত আল্লাহ্‌র আযাবের ব্যাপারে বরং তাদের ভয় ছিল ততোধিক। আর তারা এমন বাসনাও পোষণ করতে লাগলেন যে, আরো কয়েকটি দিন যদি জিহাদের হুকুম না আসত এবং আমরা আরও কিছু সময় বেঁচে থাকতাম, তবে কতই না ভাল হত! এসব কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ---(রূহুল মা'আনী)

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমান কর্তৃক তা মুলতবির আকাঙ্ক্ষার কারণ ঃ জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবত মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উত্তেজনা হঠাৎ উথলে ওঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হল মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলিম যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন কাফিরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে জিহাদের নির্দেশ কামনা করতেন কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনি অবস্থায় যখন জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধস্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, তখনই যদি জিহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাপী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানরা যদি উল্লিখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লিখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লিখিত قالوا শব্দের দ্বারা এমন

কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে মনেই বলে থাকবেন!---(বয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলিমদের সাথে নয়, বরং মুনাফিকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না।---(তফসীরে-কবীর)

রাষ্ট্রশুদ্ধি অপেক্ষা আত্মশুদ্ধি অগ্রবর্তী ঃ أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশুদ্ধির উপকরণ। অর্থাৎ এতে অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃঙ্খলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুত মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হল ফরযে-আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কিফায়া। এতে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই প্রতীয়মান হয়।---(মাযহারী)

দুনিয়া ও আখিরাতের নিয়ামতের পার্থক্য ঃ আয়াতে দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখিরাতের নিয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হল এই ঃ

(১) দুনিয়ার নিয়ামত অল্প এবং আখিরাতের নিয়ামত অধিক।

(২) দুনিয়ার নিয়ামত অনিত্য এবং আখিরাতের নিয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।

(৩) দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের সাথে সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।

(৪) দুনিয়ার নিয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত প্রত্যেক মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।--(তফসীরে-কবীর) কবি বলেছেন ঃ

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له
من الله فى دار المقام نصيب
فان تعجب الدنيا رجالا فانها
متاع قليل والزوال قريب

অর্থাৎ "অনিত্য এই দুনিয়ায় এমন লোকের জন্য কোনই কল্যাণ নেই, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনন্ত স্থিতিসম্পন্ন আখিরাতে কোন স্থান নেই। তার পরেও যদি দুনিয়া কাউকে আকৃষ্ট করে, তবে তাদের জেনে রাখা কর্তব্য যে, পার্থিব ধন-সম্পদ একান্তই অল্প এবং তার পতন ও ধ্বংস খুবই নিকটবর্তী। অর্থাৎ চোখ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই আখিরাত আরম্ভ হয়ে যাবে, যা আর কখনও শেষ হবে না।"

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা ঃ ...اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ

আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের হুকুম সম্বলিত এ আয়াতের মাধ্যমে জিহাদ থেকে বিরত লোকদের সে সন্দেহের অপনোদন করে দিয়েছেন যে, হয়তো জিহাদ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারলে মৃত্যু থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে। সেজন্যই বলা হয়েছে, এক দিন না একদিন মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই বিষয়টি যখন এমনি অবধারিত, তখন জিহাদ থেকে তোমাদের আত্মগোপনের প্রয়াস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ করেন, যা ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম মুজাহিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি এই ঃ

বিগত উম্মতগুলোর কোন এক উম্মতের জনৈকা মহিলার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে এবং কতক্ষণের মধ্যেই সে এক কন্যা সন্তান প্রসব করে। তখন সে নিজের ভৃত্যকে আগুন আনার জন্য পাঠায়। ভৃত্য দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, অমনি হঠাৎ একটি লোক তার সামনে পড়ল এবং জিজ্ঞেস করল, এ স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করেছে? ভৃত্য বলল, একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছে। তখন সে লোকটি বলল, আপনি মনে রাখবেন, এ কন্যা একশত পুরুষের সাথে যিনা (ব্যভিচার) করবে এবং শেষ পর্যন্ত মাকড়সার দ্বারা তার মৃত্যু হবে। একথা শুনে ভৃত্য ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুরি নিয়ে সে মেয়ের পেটটি ফেড়ে ফেলল এবং মনে মনে ভাবল, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ মেয়ের মা সঙ্গে সঙ্গে তার পেট সেলাই করে দিল। শেষ পর্যন্ত সে সুস্থ হয়ে উঠল এবং যৌবনে পদার্পণ করল। এ মেয়েটি এতই সুন্দরী ছিল যে, তখনকার সময়ে তদঞ্চলে এমন রূপসী দ্বিতীয়টি ছিল না।

যা হোক, সে ভৃত্য পালিয়ে সাগর পথে চলতে লাগল এবং দীর্ঘদিন যাবত রুযী-রোযগার করে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করল। অতঃপর বিয়ে করার উদ্দেশ্যে শহরে ফিলে এল। এখানে এসেই সে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পেল। প্রসঙ্গত সে তার অভিপ্রায় বৃদ্ধাকে জানিয়ে বলল যে, আমি এক অনুপমা রূপসীকে বিয়ে করব,যার তুলনা এ শহরে আরেকটি থাকবে না। তখন সে বৃদ্ধা জানাল যে, এ শহরে অমুক মেয়ের চাইতে রূপসী আর কেউ নেই। আপনি বরং তাকেই বিয়ে করে ফেলুন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা-চরিত্র করে সে তাকেই বিয়ে করে নিল। বিয়ের পর যুবতী তার এই স্বামীর পরিচয় জানতে চাইল যে, তুমি কে? কোথায় থাক? সে বলল, আমি এ শহরেরই অধিবাসী। কিন্তু এক শিশু কন্যার পেট ফেড়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর সে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনাল। সব কাহিনী শুনে যুবতী বলল, সে কন্যাটি আমিই। একথা বলে নিজের পেট খুলে দেখাল, যাতে তখনও দাগ বিদ্যমান ছিল। এটি দেখে পুরুষটি বলল, তুমি যদি সত্যি সে মেয়ে হয়ে থাক, তাহলে তোমার ব্যাপারে দুটি কথা বলছি---একটি হল এই যে, তুমি একশ পুরুষের সাথে যিনা করবে। যুবতী স্বীকার করল এবং বলল যে, তাই হয়েছে,

তবে আমার সংখ্যা মনে নেই। পুরুষটি বলল, সংখ্যা একশ। তারপর বলল, দ্বিতীয় বিষয়টি হল এই যে, তুমি মাকড়সার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

পুরুষ তার জন্য অর্থাৎ তার এই স্ত্রীর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল। তাতে মাকড়সার জালের চিহ্নমাত্রও ছিল না। একদিন সে প্রাসাদে শুয়ে শুয়েই দেয়ালে একটি মাকড়সা দেখতে পেল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, এটাই কি সে মাকড়সা তুমি আমাকে যার ভয় দেখাও? পুরুষ বলল, হাঁ এটাই। কথা শুনে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে গেল এবং বলল যে, একে তো এক্ষণেই আমি মেরে ফেলব। একথা বলে মাকড়সাটিকে নিচে ফেলে দিল এবং পায়ে পিষে মেরে ফেলল।

মাকড়সাটি মরে গেল সত্য কিন্তু মেয়েটির পায়ে এবং আঙ্গুলে তার বিষের ছিটা গিয়ে পড়ল যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। --(ইবনে কাসীর)

এ মহিলাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট প্রাসাদে বাস করেও সহসা একটি মাকড়সার দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হল। কিন্তু তার বিপরীতে এমন বহু লোক রয়েছে যারা গোটা জীবনই অতিবাহিত করেছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে। অথচ সেখানেও তাদের মৃত্যু আসেনি। ইসলামের প্রখ্যাত সৈনিক, সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সারা জীবন শাহাদাত লাভের আশায় জিহাদে নিয়োজিত থাকেন এবং শত-সহস্র কাফিরকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন। প্রতিটি ভয়সঙ্কুল উপত্যকা তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে অতিক্রম করতে থাকেন এবং সর্বদা এ প্রার্থনাই করতে থাকেন, যেন তাঁর মৃত্যু নারীদের মত ঘরের কোণে না হয়ে বরং নির্ভীক সৈনিকের মত জিহাদের ময়দানেই হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু শয্যার উপর হল। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবস্থাটি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে শান্তির নীড়ে মাকড়সার মাধ্যমেই মৃত্যুদান করেন আর যখন তিনি বাঁচাতে ইচ্ছা করেন, তখন তলোয়ারের নিচ থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন।

পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ — وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ---আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে করা হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বরণ করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিংবা ধন-সম্পদের হিফাযতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী ও শরীয়তবিরুদ্ধ নয়।---(কুরতুবী)

মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহেই নিয়ামত লাভ করেঃ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ এখানে حَسَنَةٍ (হাসানাতিন)-এর দ্বারা নিয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নিয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত ইবাদত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ ইবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নিয়ামত সীমিত ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেক না হয়?

অতএব মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ما احد يدخل الجنّة الا برحمة الله، قيل ولا انت قال ولا انا۔

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না," বলা হল, "আপনিও কি যেতে পারবেন না?" তিনি বললেন, "না, আমিও না।"---(মাযহারী)

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল ঃ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ এখানে سَيِّئَةٌ অর্থ হল বিপদাপদ।---(মাযহারী)

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফির হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ, তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে, যা আখিরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুত আখিরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপতিত বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখিরাতে তার মুক্তির কারণ হবে। অতএব এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من مصيبة تصيب المسلم الا كفّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها۔

অর্থাৎ "কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ্ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমনকি যে কাঁটাটি পায়ে ফোটে তাও।" ---(মাযহারী)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عن ابى موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدًا نكبة فما فوقها وما دونها الا بذنب وما يعفو اكثر۔

অর্থাৎ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন,

বান্দার উপর যে সমস্ত লঘু বা গুরু বিপদ আসে, সেসবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেওয়া হয়। —(মাযহারী)

মহানবী (সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক ঃ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا —আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)-কে সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রসূল নন, বরং তাঁর রিসালত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা নাই থাক; কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝٨٠

(৮০) যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহ্‌রই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে লোক রসূল (সা)-এর (প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করে (প্রকৃতপক্ষে) সে আল্লাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করে। আর (হে মুহাম্মদ!) যে লোক আপনার অবাধ্যতা করছে (সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই অবাধ্য হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা যৌক্তিকভাবেও যেহেতু ওয়াজিব, সুতরাং আপনার আনুগত্য করাও ওয়াজিব হয়েছে) আপনাকে (দায়িত্ব হিসাবে) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী করে পাঠানো হয়নি (যে আপনি তাদেরকে কুফরী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবেন। বরং আপনার উপর যে কর্তব্য আরোপ করা হয়েছে, তা পয়গাম পৌঁছে দিলেই পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়ে যায়। এর পরেও যদি তারা কুফরী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তাহলে সেজন্য আপনাকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে না। আপনি সেজন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন)।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۖ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۗ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝٨١ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۭ وَلَوْ كَانَ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝٨٢

(৮১) আর তারা বলে, আপনার আনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ্ লিখে নেন, যে সব পরামর্শ তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিস্পৃহতা অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ্ হলেন যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী। (৮২) এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর এসব (মুনাফিক) লোকেরা (আপনার হুকুম-আহ্কাম শুনে আপনার সামনে মুখে মুখে যদিচ) বলে: (আপনার) আনুগত্য করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনার নিকট থেকে (উঠে) যখন তারা বাইরে চলে যায়, তখন রাতের বেলায় (গোপনে গোপনে) তাদের কোন কোন দল (অর্থাৎ তাদের সর্দারদের দল) পরামর্শ করে সেসব কথার পরিপন্থী, যা তারা (আপনার সামনে) বলেছিল। (আর যেহেতু তারা সর্দার সেহেতু মূলত তারাই পরামর্শ করে থাকে এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ থাকে তাদেরই অনুগত। অতএব, বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে সবাই সমান।) বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের আমলনামায়) সে সমস্তই লিখে রাখেন, যা (তারা রাতের বেলায়) পরামর্শ করে থাকে। (সময়মত এসবের শাস্তি তিনি দেবেন।) কাজেই আপনি তাদের (এ সমস্ত বেকার বিষয়ের) প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না (এবং সেদিকে লক্ষ্যও করবেন না)। তাছাড়া (এসব ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনাও করবেন না, বরং এ সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিন।) বস্তুত তিনিই যথেষ্ট ও কার্য সম্পাদনকারী (তিনিই তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের যথাযথ প্রতিরোধ করবেন)। সুতরাং (তাদের দুষ্টামিতে কখনও মহানবীর কোন অনিষ্ট সাধিত হতে পারেনি।) তারা কি (কোরআনের অকাট্যতা, তার অলংকারপূর্ণ বর্ণনা এবং গায়েবী বিষয়ে সঠিক ও যথার্থ সংবাদ দান প্রভৃতি বিষয় দেখেও) কোরআনের উপর লক্ষ্য করে না (যাতে এর ঐশী কালাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে)? এটা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কালাম হত, তাহলে এর (বিষয়গুলোর) মধ্যে (সেগুলোর আধিক্যের দরুন ঘটনার বিবরণ ও অকাট্যতার দিক দিয়ে) বহু পার্থক্য দেখতে পেত। (কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ে একেকটি পার্থক্য হলেই অধিক বিষয়ে অধিক পার্থক্য দেখা দিত। অথচ এতে বিষয়বস্তুর মাঝেও কোন বৈপরীত্য বিদ্যমান নেই। সুতরাং এটা আল্লাহ্র কালাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ- আয়াতে সেসব লোকের নিন্দা করা হয়েছে, যারা দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে; মুখে এক কথা এবং মনে অন্য কথা পোষণ করে। অতঃপর এসব লোকের ব্যাপারে রসূলে-করীম (সা)-এর কর্মপন্থা সম্পর্কে বিশেষ হেদায়েত দান করা হয়েছে।

নেতৃত্ব দানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ঃ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا- মুনাফিকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা আপনার নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রসূলে করীম (সা)-এর বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টাসিধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরূপী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সংকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদ চুম্বন করবে।

কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ঃ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহবান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ---এতে বাহ্যত একটি সূক্ষ্ম না বলে বলেছেন أَفَلَا يَقْرَؤُنَ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা'হল এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তিলাওয়াত

বা আবৃত্তির দ্বারা--যাতে তাদাব্বুর বা চিন্তা-গবেষণার কোন অস্তিত্ব নেই---অর্জিত হবে না, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ কোরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হল কোরআনের চাহিদা। কাজেই কোরআন-সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদদেরই একক দায়িত্ব--এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদদের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হল কৃতকার্য হওয়ার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জন-সাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলিমের কাছে কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলিমের সাহায্য নেবে।

কোরআন ও সুন্নাহ্র তফসীরের কয়েকটি শর্ত ঃ উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু-আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সেমতে প্রতিটি স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে-হাকীমের ভিতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলা বাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলিম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোনদিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্রে সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেওয়া হল? একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদী-নালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সংস্কার ও নির্মাণের ঠিকাদারী শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদের কেন দেওয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধি কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানুনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে এ কাজ সম্পাদন করতে পারি! তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের

নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যে সব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমাদেরও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করতে হবে। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে। কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তখন আলিম সমাজের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে! যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কিয়াস একটি দলিল ঃ এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাস-'আলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় 'কিয়াস' বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা ঃ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا এ আয়াতে উল্লিখিত اختلاف كثير (বা বহু মতবিরোধ)

এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ কোরআনে কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মত-পার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র কালাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ত্রুটি, না আছে তওহীদ, কুফরী কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়েবী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরি না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতায় কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষ্য-বিবৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে—আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। আর এটাই হল কালামে-ইলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ
إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

(৮৩) আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন কোন (নতুন) বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ এসে পৌঁছে, চাই (সে সংবাদ) শান্তির হোক কিংবা ভীতিজনক হোক, (যেমন, মুসলমানদের কোন বাহিনীর কোন জিহাদে গমন এবং তাদের বিজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছান; এটা শান্তির সংবাদ। কিংবা তাদের পরাজিত হওয়ার যদি খবর আসে; যেটা দুঃখের সংবাদ) তাহলে সে সংবাদটিকে (সঙ্গে সঙ্গে) রটিয়ে দেয়। (অথচ দেখা যায়, সেটি ছিল ভুল। আর যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তথাপি অনেক সময় তার রটনা প্রশাসনিক কল্যাণের বিরোধী হয়ে থাকে)। পক্ষান্তরে (নিজের ভাবে প্রচার করার পরিবর্তে) যদি এরা এ সংবাদটি রসূলে-করীম (সা)-এর উপর এবং বিচক্ষণ সাহাবায়ে কিরামের মতামতের উপর অর্পণ করত (এবং নিজেরা যদি এসব ব্যাপারে কোন রকম দখল না দিত), তাহলে এ সমস্ত খবরাখবরের (যথার্থতা কিংবা ভ্রান্ততা এবং এগুলো প্রচারযোগ্য কি নয় সে) বিষয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন যারা এসব বিষয় অনুসন্ধান করে থাকেন। (যেমন করে সাধারণত উপলব্ধি করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা যে ব্যবস্থা করতে চান, সেমতেই এসব রটনাকারীদের কাজ করা উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে তারা যদি কোন রকম হস্তক্ষেপ না করত, তা হলে এমন কি বিগড়ে যেত? সুতরাং উল্লিখিত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করার পর যা আপাদমস্তক দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে পরিপূর্ণ অনুগ্রহস্বরূপ মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে—) আর যদি তোমাদের প্রতি (কোরআন ও রসূল প্রেরণের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র (বিশেষ) রহমত ও অনুগ্রহ না হত, তবে তোমরা সবাই (দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণকর বিষয়গুলো অবলম্বন করে) শয়তানের অনুগামী হয়ে পড়তে, সামান্য কতিপয় লোক ব্যতীত (যারা আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দান, সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধির দৌলতে তা থেকে বেঁচে থাকেন)। (অন্যথায় তারাও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। সুতরাং

এমন মহান পয়গম্বর এবং এমন মহান গ্রন্থ কোরআনকে মুনাফিকদের বিপরীতে একান্ত অনুগ্রহের দান মনে করে তার অনুসরণ ও আনুগত্য করা উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নযুল ঃ وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ

হযরত ইবনে-আব্বাস, যাহহাক ও আবূ মা'আয (রা)-এর মতে এ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত হাসান (রা)-সহ অধিকাংশের মতে এ আয়াতটি দুর্বল ও কমজোর মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ।

আল্লামা ইবনে-কাসীর এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এ আয়াতের শানে-নযুল প্রসঙ্গে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর হাদীসটি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। তা হল এই যে, হযরত উমরের নিকট একবার খবর পৌঁছাল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এ খবর শুনে তিনি নিজের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে এলেন এবং মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনতে পারলেন যে, মসজিদের ভেতরেও লোকদের মধ্যে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছে। এসব লক্ষ্য করে তিনি বললেন, এ সংবাদটি অনুসন্ধান করে যাচাই করা দরকার। সেমতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! "আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন?" হুযুর বললেন, 'না তো'! হযরত উমর (রা) বলেন, বিষয়টি অনুসন্ধান করার পর আমি মসজিদের দিকে ফিরে এলাম এবং দরজায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম যে, "রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবিগণকে তালাক দেন নি। আপনারা যা বলছেন, তা ভুল।" এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।---(ইবনে-কাসীর)

যাচাই না করে কোন কথা রটনা করা মহাপাপ ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রসূলে করীম (সা)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ---অর্থাৎ কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين

অর্থাৎ যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু'জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী।---(ইবনে-কাসীর)

উলুল-আমর কারা ঃ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ—আয়াতে উল্লিখিত استنبا ط শব্দের প্রকৃত হচ্ছে অর্থ কূপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কূপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরোয় তাকে আরবীতে ماء مستنبط বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।—(কুরতুবী)

'উলুল-আমর' বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত হাসান, কাতাদাহ ও ইবনে আবী লায়লা (র) প্রমুখের মতে দায়িত্বশীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহ্গণকে বোঝায়। হযরত সুদ্দী (র) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লামা আবূ বকর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, দু'টি অর্থই ঠিক। কারণ, 'উলুল-আমর' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, 'উলুল-আমর' বলতে ফকীহ্দের বোঝানো যেতে পারে না। তার কারণ, اولوالامر (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে সেসব লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। বলা বাহুল্য, এ কাজটি ফকীহ্দের নয়। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, হুকুম চলার দুটি প্রেক্ষিত রয়েছে। এক, জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। দুই, বিশ্বাস ও আস্থার দরুন হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহ্রা অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানরা নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলিম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্যপালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলিমদের হুকুম মান্য করা ওয়াজিবও বটে। সুতরাং তাঁদের ক্ষেত্রেও 'উলুল-আমর'-এর প্রয়োগ যথার্থ হবে।—(আহকামুল কোরআন, জাসসাস)

আলোচ্য বিষয়ের অধিকতর সবিস্তার বর্ণনা أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতের আওতায় ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কিয়াস ও ইজ্তিহাদ ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোন 'নস' তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম 'ইজতিহাদ' ও কিয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রসূলে করীম (সা)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহ্দের নিকট যাও। কারণ, তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, 'নস' বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র নির্দেশ দু'রকম। কিছু হল সরাসরি 'নস' বা কোরআন-সুন্নাহ্-ভিত্তিক এবং কিছু হল পরোক্ষ ও অস্পষ্ট যা আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।

তৃতীয়ত, এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলিম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।

চতুর্থত, এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলিম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্যকর্তব্য।---(আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস)

রসূলে করীম (সা)-ও উদ্ভাবন ও প্রমাণ সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলে-করীম (সা)-ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু'রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রাসূলে-আকরাম (সা) এবং অপরজন হচ্ছেন 'উলুল-আমর'। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ --আর এই নির্দেশটি হল ব্যাপক। এতে উল্লিখিত দু'রকম লোকের মধ্যে কাউকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুজুর নিজেও আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত।---(আহ্‌কামুল-কোরআন, জাসসাস)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ (১) কারও মনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতটুকুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয় শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে অনুসারেই কাজ করবে। বলা বাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ

বাক্যে শত্রুর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা মাস'আলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন্ দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অথচ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহল উদ্ভাবন

(أ ستنبا ط) করা। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে।—(আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় ঃ (২) ইস্তিম্বাত-এর মাধ্যমে আলিমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করবেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক। বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট।—(আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيْلًا ۝

(৮৪) আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন ; আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ্ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]! যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখবেন, তখন) আপনি (আল্লাহ্র রাহে কাফিরদের সাথে) যুদ্ধ করুন। (আর যদি মনে হয় যে, আপনার সাথে কেউ নেই তবুও সেজন্য চিন্তা করবেন না। কারণ,) আপনি আপনার নিজস্ব কাজকর্ম ছাড়া (অন্য কারও কাজ-কর্মের জন্য) দায়ী নন। আর (যুদ্ধ করার সাথে সাথে) মুসলমান-দের (শুধু) উৎসাহ দান করুন। (এর পরেও যদি কেউ আপনার সমর্থন না করে, তবে আপনি দায়িত্বমুক্ত। তখন আর আপনি জবাবদিহির ব্যাপারেও চিন্তা করবেন না এবং একাকিত্বের জন্যও দুঃখ করবেন না। তার কারণ,) আল্লাহ্র প্রতি এই আশা রয়েছে যে, তিনি শীঘ্রই কাফিরদের যুদ্ধবল রহিত করে দেবেন (এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেবেন)। আর (যদিও এরা যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হয়, কিন্তু) আল্লাহ্ সমরশক্তিতে (তাদের তুলনায় অসংখ্য গুণ) বেশী কঠিন (ও শক্তিশালী)। তিনি বিরোধীদের অতি কঠিন শাস্তি দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-নযুল ঃ শাওয়াল মাসে ওহুদ যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবার পর পরবর্তী যিলকদ মাসে কাফিরদের ওয়াদা অনুযায়ী রসূলে আকরাম (সা) কাফিরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য বদরে যেতে চাইলেন। (একেই ঐতিহাসিকগণ 'বদ্‌রে ছোগ্‌রা' বা 'ছোট বদর' বলে অভিহিত করেন।) তখন কেউ কেউ আহত হওয়ার কারণে, আবার অনেকে গুজবের দরুন সেখানে যেতে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে রসূলে-করীম (সা)-কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, এসব অপরিপক্ক মুসলমান যদি যুদ্ধে যেতে ভয় করে, তবে হে রাসূল (সা) একাই যুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আল্লাহ্ হবেন আপনার সাহায্যকারী। এ হেদায়েত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সত্তর জন সঙ্গী নিয়ে 'বদরে-ছোগরা' অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ওহুদ যুদ্ধের পর আবূ সুফিয়ানের সাথে এরই ওয়াদা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ সুফিয়ান ও কোরায়শ কাফিরদের মনে ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে দিলেন। তাদের কেউই মোকাবিলা করতে এলো না। ফলে তারা কৃত ওয়াদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কথামত কাফিরদের যুদ্ধ এভাবেই বন্ধ করে দিলেন। আর এদিকে রসূলে করীম (সা) স্বীয় সঙ্গী সাথীদের নিয়ে-নিরাপদে ফিরে এলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

কোরআনী বিধানের বর্ণনাশৈলী ঃ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ—এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রসূলে-করীম (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানের এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে—'আশা করা যায় আল্লাহ্ কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন। অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ্ তা'আলার সমর্থন রয়েছে যার সমরশক্তি কাফিরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তিদানের ক্ষেত্রেও আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

مُقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

(৮৫) যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৮৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তার চেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন —এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে লোক ভাল সুপারিশ করবে (অর্থাৎ যার নিয়ম-পন্থা ও উদ্দেশ্য দুটোই শরীয়ত-সম্মত হবে) তাকে সে সুপারিশের বিনিময়ে (পুণ্যের) একটি অংশ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যে লোক মন্দ বিষয়ে সুপারিশ করবে (অর্থাৎ যার পন্থা ও উদ্দেশ্য অবৈধ হবে) সেও (এই সুপারিশের) দরুন (পাপের একটা) অংশ প্রাপ্ত হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (তিনি স্বীয় কুদরতের দ্বারা সৎকর্মের জন্য সওয়াব এবং অসৎকর্মের জন্য আযাব দিতে পারেন।) আর তোমাদেরকে যখন কেউ (শরীয়তানুযায়ী বৈধ পন্থায়) সালাম করবে, তখন তোমরা সে সালামের চেয়ে উত্তম বাক্যের মাধ্যমে উত্তর দান কর। অথবা উত্তর দিতে গিয়ে তেমনি বাক্য উচ্চারণ কর। (এতদুভয় ব্যাপারেই তোমাদেরকে অধিকার দেওয়া হচ্ছে।) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে (অর্থাৎ যাবতীয় কাজ-কর্মের) হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।

(অর্থাৎ এটাই হল তাঁর আইন ও রীতি। তবে কৃপাবশত ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।) তোমাদের সবাইকে একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্-তা'আলার চাইতে কার উক্তি অধিক সত্য হবে? (তিনি যখন এ সংবাদ দিচ্ছেন, তখন তা সম্পূর্ণ সত্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুপারিশের স্বরূপ, বিধি ও প্রকারভেদ ঃ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً...

—এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ—দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর

স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে نصيب শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كفل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক; অর্থাৎ কোন কিছুর অংশ বিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نصيب শব্দটি ভাল অংশ এবং كفل শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; যদিও কখনো ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (তাঁর রহমতের দুটি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شَفَاعَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবী ভাষায় شَفْعٌ শব্দ জোড় অর্থে এবং এর বিপরীতে وِتْرٌ শব্দ বেজোড় অর্থে ব্যবহার করা হয়। অতএব شفاعة এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেওয়া কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে দেওয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফা'আত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জবরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহ্গার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রসূলে-করীম (সা) বলেন ঃ الدال على الخير كفاعله অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী নিজে পায়।---(মাযহারী)

ইবনে মাজায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه ائس من رحمة الله ـ

---অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারাও সাহায্য করে, তাকে কিয়ামতে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে ঃ "এ ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।"---(মাযহারী)

এতে জানা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ এবং এতে সমান সওয়াব পাওয়া যায়, তেমনি অসৎ ও পাপকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ্।

আয়াতেব শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

আভিধানিক দিক দিয়ে مُقِيْتٌ শব্দের অর্থ তিনটি ঃ এক, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, দুই, উপস্থিত ও দর্শক এবং তিন, রুযী বন্টনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে---আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কোন্ নিয়তে সুপারিশ করে ; আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘুষ হিসাবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিযিক ও রুযী বন্টনের কাজে আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার। যার জন্য যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারও সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না ; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ كان الله فى عون عبده مادام فى عون اخيه অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপৃত থাকে।

সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اشفعوا فلتؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء অর্থাৎ তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ফয়সালা করেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক।

এ হাদীসে একদিকে বলা হয়েছে যে, সুপারিশ করলে সওয়াব পাওয়া যায়। অপর-দিকে সুপারিশের সংজ্ঞাও বর্ণিত হয়েছে যে, যে দুর্বল ব্যক্তি নিজের কথা কোন উর্ধ্বতন লোকের কাছে পৌঁছাতে এবং সঠিকভাবে প্রয়োজন ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়, তুমি তার কথা সেখানে পৌঁছিয়ে দেবে। অতঃপর তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হোক বা না হোক, অভীষ্ট কাজ পূর্ণ হোক বা না হোক, সে বিষয়ে তোমার কোন দখল থাকা উচিত নয় এবং সুপারিশের বিরুদ্ধাচরণ তোমার কাছে অপ্রীতিকর না হওয়া উচিত। হাদীসের শেষ বাক্য ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء এর অর্থ তাই। এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন---আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থে من يشفع منها বাক্যে শব্দটিকে سبب সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। তফসীরে-মাযহারীতে তফসীরবিদ মুজাহিদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মুক্ত করা বাঁদী বরীরা স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেওয়ার পর মুগীছ বরীরার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ সাল্লা-ল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীরার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোধার্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নীতির বাইরে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাই পরিষ্কার ভাষায় আরয করলেনঃ তা হলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রসূলুল্লাহ্ (সা) হৃষ্টচিত্তে তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়। আজকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আজকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়; বরং শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ

সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোনাহ্। এটি কারও অর্থ-সম্পদ কিংবা কারও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেওয়ার মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবর করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনের অভাব দূর করার জন্য অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে তাকে বিলিয়ে দেওয়ার অনুরূপ।

সুপারিশ করে বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ এবং হারাম ঃ সুপারিশ করে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ঘুষ। হাদীসে একে سحت বা হারাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘুষ হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাজের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক---সর্বপ্রকার ঘুষই এর অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্‌শাফ প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ঐ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ সুপারিশটি যেন কোন জাগতিক লাভালাভ অর্জনের জন্য না হয়; বরং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘুষ যেন না নেওয়া হয়। এ সুপারিশ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য না হয় এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যও যেন না হয়।

বাহরে মুহীত, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ কোন মুসলমানের অভাব-অনটন দূর করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্য নেক দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলে ঃ ولك بمثل অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকেও অনুরূপ দান করুন।

সালাম ও ইসলাম ঃ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

---এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تحية শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ تحية—এর শাব্দিক অর্থ কাউকে حَيَّاكَ اللهُ বলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে জীবিত রাখুন! ইসলাম-পূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাতকালে একে অন্যকে حَيَّاكَ اللهُ কিংবা أَنْعَمَ اللهُ بِكَ عَيْنًا কিংবা أَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করত। ইসলাম এ সালামপদ্ধতি পরিবর্তন

করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ তুমি সর্ব প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন ঃ 'সালাম' শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-এর অর্থ এই যে, اَللّٰهُ رَقِيْبٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম ঃ জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয় ; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। অর্থাৎ সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা---সবাই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি ইবাদত এবং মুসলমান ভাইকে খোদার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার উপায়ও বটে।

এতদসঙ্গে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে মুসলমান ভাইকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখার দোয়া করে, সে যেন এ ওয়াদাও করে যে, তুমি আমার হাত ও মুখ থেকে নিরাপদ, তোমার জানমাল ও ইজ্জত আবরুর আমি সংরক্ষক।

ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়ায়নার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اتدرى ما السلام يقول انت امن منى---অর্থাৎ সালাম কি বস্তু, তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোট কথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা, (১) এতে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র (২) আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেওয়া (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده অর্থাৎ যার হাত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, সে-ই প্রকৃত মুসলমান।

আফসোসের বিষয় মুসলমানরা যদি এ বাক্যটিকে একটি সাধারণ প্রথা মনে না করে এর প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করে ব্যবহার করত, তবে সম্ভবত সমগ্র জাতির সংশোধনের

পক্ষে এটিই যথেষ্ট হত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচলিত করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং একে সর্বোত্তম কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি সালামের অনেক ফযীলত, বরকত ও সওয়াব বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন ঃ

"তোমরা মু'মিন না হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পরে একে অন্যকে মহব্বত না করে তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, তোমরা যদি এটি বাস্তবায়িত কর, তবে তোমাদের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। তা এই যে, পরস্পরের মধ্যে সালামের রীতিকে ব্যাপকতর কর। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিচিত ও অপরিচিত মুসলমানকে সালাম কর।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি মানুষকে আহার করাও এবং পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত, সবাইকে সালাম কর।---(বুখারী ও মুসলিম)

মসনদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে-ই আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী।

মসনদে বায্যার ও মু'জামে-কবীর তিবরানীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নাম, যা তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই তোমরা পরস্পরকে ব্যাপকভাবে সালাম কর। কেননা, মুসলমান যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে সালাম করে, তখন সে আল্লাহ্র কাছে একটি উচ্চ মর্তবা লাভ করে। কারণ, সে সবাইকে সালাম অর্থাৎ আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মজলিসের লোকেরা যদি তার সালামের জওয়াব না দেয়, তবে তাদের চাইতে উত্তম ব্যক্তিরা তার জওয়াব দেবে অর্থাৎ আল্লাহ্র ফেরেশতারা।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি সালাম দিতে কৃপণতা করে, সে-ই বড় কৃপণ।---(তিবরানী, মু'জামে কবীর)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এসব উক্তি সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে যে কিরূপ অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে, একটি রেওয়ায়েত থেকে তা অনুমান করা যায়। বর্ণিত আছে, সালাম করে ইবাদতের সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যেই হযরত ইবনে উমর (রা) অধিকাংশ সময় বাজারে যেতেন---কোন কিছু বেচাকেনা করা উদ্দেশ্য থাকত না। ---(মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদেরকে সালাম করা হলে তোমরা তার জওয়াব আরও উত্তম ভাষায় দাও, কিংবা কমপক্ষে তদনুরূপ বাক্যই বলে দাও। রসূলুল্লাহ্ (সা) কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন। একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ

السلام عليك يا رسول الله---তিনি উত্তরে একটি শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে